বাংলার বীর বিদ্রোহী

সুধাংশু পাত্র



পাত্র'জ পাবলিকেশান
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৮৮
সেপ্টেম্বর ১৯৮১

প্রকাশক :
শ্রীমান মানসকুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশান
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা — ৭৩

প্রচ্ছদ :
প্রবীর ঘোষ

বাইণ্ডিং :
ঘোষ স্টেশনারী ওয়ার্কস
কলিকাতা — ৯

মুদ্রণে :
সোমা প্রকাশন
২এ, কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা — ৬

উৎসর্গ

বন্ধুবর

শ্রীযুত ধীমান দাশগুপ্ত

প্রীতিভাজনেষু

যে সব বই থেকে সাহায্য গ্রহণে কৃতজ্ঞ—

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়

মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু

মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়

বাঙালী চরিতাভিধান—সংসদ

নীল বিদ্রোহ ও তৎকালীন বাঙালী সমাজ—প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত

বিষয় সূচী

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক মজনু শাহ

(১৭৬৩– ১৮০০)

ইংরাজী ১৭৫৭ সাল। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করল বিদেশী শক্তি। আর তখনই ভারতের আকাশে ঘনীভূত হল দুর্যোগের কালো মেঘ। প্রথম ওরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটিয়েছিল। আর বাংলাকে কেন্দ্র করেই বিস্তার করেছিল শোষণের জাল। তাই দুর্ভাগ্যের কবলে প্রথম পতিত হয়েছিল বাংলা ও বিহার।

কূট বুদ্ধিতে ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় ছিল একেবারে পাকা। সরাসরি গ্রহণ করলো না এদেশের শাসন ক্ষমতা। শিখণ্ডির মত একজন নবাবকে সামনে রেখে শাসনের নামে আরম্ভ করলো প্রচণ্ড শোষণ। কোন নীতি এবং মনুষ্যত্বের ধার ধারল না। দ্বিধা করলো না অর্থলাভের জন্য ছল, চাতুরী এবং যে কোন হীন পন্থা গ্রহণে। তাই এতকাল ধরে বাংলার সাধারণ মানুষ, যারা ক্ষেতে খামারে কাজ করতো, রাজনৈতিক উত্থান-পতন যাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতো না তারাই হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিকার।

আগে সাধারণ মানুষ দল বেঁধে গাঁয়ে বাস করতো, চাষ করতো যৌথ ভাবে। ফসল উঠলে ফসলের একটা অংশ রাজকর হিসাবে দিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিত দিন। গোয়াল ভরা গরু ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল, অবসর সময়ে তাঁতীরা কাপড় বুনতো, কুমোররা হাঁড়ি কলসী তৈরি করতো, কর্মকাররা তৈরি করতো লোহার জিনিসপত্র। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছিল পেতল-কাঁসার কাজ, হাতীর দাঁত ও শাঁখার কাজ, রেশমের কাজ, এমন আরও কত

কাজ। কিন্তু এ সবের জন্য কোন কর দিতে হতো না রাজাকে। বেশ সুখের ছিল বাংলা। তাইতো নাম হয়েছিল সোনার বাংলা।

ইংরাজদের সহ্য হল না এদের সুখ। শনি ঠাকুরের দৃষ্টির মত, রূপকথার সুয়োরাণীর মত ওদের সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিল। প্রথমে জমির উপর এবং শিল্পের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভাবে কর চাপালো। অতিরিক্ত মুনাফা লুটতে জমিকে বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করলো। সাধারণ মানুষের উঠলো নাভিশ্বাস।

পলাশীর যুদ্ধের মাত্র সাতটি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই অত্যাচারী ইংরাজদের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা ভেবেছিল, এ দেশের মানুষ এক একটি নির্বিষ ভুজঙ্গ—ওরা মার খেতে জানে, ছোবল দিতে জানে না—তাই কুকুর শেয়ালেরও অধম মনে করেছিল ঐ মনুষ্যত্বহীন বৃটিশ বণিক সম্প্রদায়। যত প্রকারের শাসন ও শোষণ সম্ভব, সবই প্রয়োগ করেছিল ওদের উপর।

অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাংলার মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। প্রথমে তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল। তারপর দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়লো বাংলা ও বিহারের নানাস্থানে।

বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়েছিল ইংরাজী ১৭৬৩ সালে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের মাত্র ছ' বছর পরে এবং বিদ্রোহের জের চলেছিল ১৮০০ সাল পর্যন্ত—এক রকম অর্ধ শতাব্দী কাল। কথিত আছে, এই বিদ্রোহকে দমন করতে আধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়েছিল। বহু ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষকে বরণ করতে হয়েছিল মৃত্যু। দীর্ঘস্থায়ী উক্ত বিদ্রোহের ইংরাজরা নামকরণ করেছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

বাংলা ও বিহারের এই প্রথম বিদ্রোহকে কেন যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে ইতিহাস একরকম নীরব। বর্তমানের ঐতিহাসিকরা অনুমান করেছেন, মুঘল সাম্রাজ্যের শেষের

দিকে ভারতবর্ষের ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ বাংলা ও বিহারের সমতলভূমি এলাকায় নবাবদের কাছ থেকে কিছু কিছু নিষ্কর জমি লাভ করে কৃষিকাজে মন দিয়েছিলেন এবং গৃহীর জীবন যাপন করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা গৃহীদের পোষাকে থাকতেন না। ব্যবহার করতেন ফকির-সন্ন্যাসীর পরিধেয় এবং বছরের বিশেষ বিশেষ সময় তাঁরা তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হতেন। তাছাড়া গৃহেও ব্যবস্থা করতেন নানা ধর্মানুষ্ঠানের।

ইংরাজেরা বাংলা ও বিহারের ক্ষমতা দখল করায় একেবারে নির্লজ্জের মত চালাতে লাগলো কৃষক শোষণ। সেই শোষণ থেকে বাদ পড়লেন না গৃহী ফকির ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। তদুপরি যে ধর্মানুষ্ঠান ও তীর্থভ্রমণকে জীবনের সার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার উপরেও বসানো হল কর। নাম হল "তীর্থকর"। এবার রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ফকির ও সন্ন্যাসীরা। আর তাদের হাতে হাত মেলালো উৎপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়। অপর দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর বিরাট মুঘল বাহিনী বেকার হয়ে পড়েছিল। তাদের জমিজমা ছিল না। শাসকরাও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলো না। ফলে বেকার সৈন্যরা একরকম চুরি ডাকাতির দ্বারাই নিজেদের পেটের খোরাক সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছিল।

চুরি করতে গিয়ে বিবেকে বাধলো তাদের। কার ঘরে চুরি ডাকাতি করবে? হাহাকার পড়ে গেছে গ্রামে গঞ্জে। করের দায়ে কৃষক কৃষি ছেড়েছে। তাঁতীর তাঁত বন্ধ। ঘরে ঘরে অভাব, ঘরে ঘরে অনটন। অথচ তাদেরই রক্ত জল করা অর্থে ভরে উঠেছে ইংরাজ কুঠিগুলি। বেকার সৈন্যদের তখন দৃষ্টি পড়ল ওই কুঠিগুলির উপর। কিন্তু সুরক্ষিত সেই কুঠিগুলিতে হানা দেওয়া দশবিশজনের শক্তির বাহিরে ছিল। তখন তারাও যোগদান করলো ঐ বিদ্রোহীদের দলে।

প্রকৃত পক্ষে ফকির ও সন্ন্যাসীরাই ছিলেন বিদ্রোহের উদ্যোক্তা।

তাঁরাই প্রথম বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করে ইংরাজ কুঠি লুণ্ঠন করতে এবং সেই লুণ্ঠিত অর্থকে ভাগ করে দিতে চাইলেন সাধারণের মধ্যে।

প্রথম ইংরাজ কুঠি আক্রান্ত হল ঢাকায় ১৭৬৩ সালে। ইংরাজেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এদেশের দুর্বল মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবে। প্রথমটায় তাই তারা হতভম্ব হয়ে গেছিল। তারপর এতগুলি বিদ্রোহীর সামনাসামনি হতে ভরসা না পেয়ে কুঠির পরিচালকরা চোরের মত পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো। তখন বিদ্রোহীরা ঐ কুঠিটি রেখে দিল নিজেদের অধিকারে। অবশ্য পরের বছর ইংরেজরা যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল এই কুঠি।

ঢাকার কুঠি লুণ্ঠিত হওয়ার পর ইংরাজরা কুঠিতে কুঠিতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কিছু কিছু সৈনিক মোতায়েন করেছিল। তাতে বিন্দুমাত্র ভীত হল না বিদ্রোহীরা। ঢাকার কুঠি লুণ্ঠনের কয়েক মাস পরেই তারা আক্রমণ করলো রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠিটি। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কম্পিত করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো ইংরাজ রক্ষী বাহিনীর উপর। দু'পক্ষে হল তুমুল যুদ্ধ শেষে বিদ্রোহীরা কুঠির পরিচালক বেনেট সাহেবকে হত্যা করে হস্তগত করলো কুঠিতে সংরক্ষিত প্রচুর ধনসম্পদ।

পরপর দুটি কুঠি লুণ্ঠন করার পর বিদ্রোহীদের মনোবল আরও দৃঢ় হল। এখানে সেখানে অতর্কিতে আক্রান্ত হতে লাগলো কুঠিগুলি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জয়লাভ করলো বিদ্রোহীরা। ইংরাজ শাসকবর্গ এবার হাত গুটিয়ে বসে রইল না। বিদ্রোহীদের সায়েস্তা করতে সচেষ্ট হল। কিন্তু বিদ্রোহীরা এমন চতুর ছিল যে কোনো প্রকারে তাদের হদিস খুঁজে পেল না সরকার।

তিন বছর পরে, ১৭৬৬ সালে বিদ্রোহীরা সর্বপ্রথম বিশাল বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রামানন্দ গোঁসাই নামে এক সন্ন্যাসী আর ইংরাজ

পক্ষের সেনাপতি ছিলেন লেঃ মরিসন। সঙ্গে ছিল প্রচুর কামান ও বন্দুক। রামানন্দ গোঁসাই বুঝতে পারলেন, ইংরাজদের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে তাঁর বাহিনী আদৌ সুবিধা করতে পারবে না। গেরিলা যুদ্ধের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন তিনি। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো বিদ্রোহীরা। মরিসনের সৈন্যবাহিনী তৎক্ষণাৎ উল্লাসে মত্ত হয়ে পেছু ধাওয়া করলো। কোন শৃঙ্খলা তখন আর ছিল না। হঠাৎ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রুখে দাঁড়ালো বিদ্রোহীরা। মাত্র চারশ' বিদ্রোহী ছিন্ন ভিন্ন করে দিল বিরাট এক বৃটিশ বাহিনীকে লেঃ মরিসন কোন রকম পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

পরের বছর বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হল পাটনা। বিদ্রোহীরা সমবেত হয়ে কেবল স্থানীয় ইংরাজ কুঠিগুলি লুণ্ঠন করলো না. ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষক জমিদারদের কাছারী লুণ্ঠন করেও দারুণ সন্ত্রাস সৃষ্টি করলো। এখানে সেখানে হল খণ্ড যুদ্ধ। কিন্তু প্রতিটি স্থানে বিদ্রোহীদের হল জয়। কুঠির ইংরাজ পরিচালকরা এবং জমিদাররা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলে। তখন পাটনার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য সুসজ্জিত করা হল ইংরাজ বাহিনী। তাদের মোকাবিলা করতে মিলিত হল প্রায় পাঁচ হাজার বিদ্রোহী। এবারও বিদ্রোহীরা গ্রহণ করলো গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি। বিরাট ইংরাজ-বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা দখল করলো সারেঙ্গি জেলার হুসিপুর দুর্গ। এবার বিদ্রোহীদের ক্ষমতা হল সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই দুর্গকে তারা বেশিদিন নিজেদের অধিকারে রাখতে সক্ষম হল না। পরে ইংরাজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন উডিংয়ে বেশ কিছু সংখ্যক কামানের সাহায্যে অধিকার করলো দুর্গ।

অতঃপর বিদ্রোহীরা তাদের ঘাঁটি স্থাপন করলো উত্তরবঙ্গে। কাছেই ছিল নেপাল সীমান্ত। তাছাড়া কাছাকাছি অরণ্য ছিল বলে বিদ্রোহীদের আত্মগোপন করতে সুবিধা হবে বিবেচনা করে তারা সেইখানেই ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। জলপাইগুড়ি জেলায় একটা

দুর্গও নির্মান করলো। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, বাংলা ও বিহারের বুক থেকে স্বৈরাচারী ইংরাজ শাসনকে অপসারিত করে নিজেরাই শাসন করবে। তাই শুরু করলো তারা ইংরাজ বিতাড়ন। এখানে সেখানে হত্যাকাণ্ডও অনুষ্ঠিত হল। অল্পদিনেই ইংরাজ-শূন্য হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের একটা বৃহৎ অঞ্চল।

শঙ্কিত হয়ে উঠল কোম্পানির শাসকবর্গ। তারা বিদ্রোহীদের সমুচিত শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জির অধীনে প্রেরণ করলো একটা বিরাট সৈন্যদল। কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না ম্যাকেঞ্জি। তখন আর একটি সৈন্যদল নিয়ে লেঃ কিথ যোগ দিলেন ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে। বিদ্রোহীরা এবারও সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করলো। সুকৌশলে ইংরাজ বাহিনীকে করলো পর্যুদস্ত এবং লেঃ কিথকে করলো হত্যা। সমগ্র উত্তরবঙ্গে ঘোষিত হল বিদ্রোহীদের জয়। এবার রীতিমত ভীত হয়ে উঠলো ইংরাজরা।

সারা বাংলা ও বিহারে বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহীরা ইংরাজদের উপর আক্রমণ চালালেও ইংরাজরা তাদের শোষণযন্ত্রকে এতটুকু শিথিল করলো না। সাগরপারের সুদূর শ্বেতদ্বীপ থেকে তারা ছুটে এসেছে এতদূরে কেবল সম্পদের আশায়। রক্ত খেকো জোঁকের মত মাটি কামড়ে পড়ে রইল এবং বিদ্রোহীদের দমন করার উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হল। অধিকন্তু আরও জোরদার করলো শোষণকে। ফলে পলাশীর যুদ্ধের মাত্র বার বছর পরে অর্থাৎ ১৭৬৯-৭০ সালে বাংলা ও বিহারের বুকে দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যা ইতিহাসে ইংরাজ সৃষ্ট "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে কথিত। করভারে জর্জরিত কৃষক কৃষি কাজ ছাড়তে বাধ্য হল। তাঁতীরা অনেক আগেই বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। এবার উৎপন্ন ফসলের প্রায় সবটুকু শাসক শ্রেণী গ্রাস করায় চাষীরাও ঘর ছাড়তে বাধ্য হল। তবুও তাদের পেছনে পেছনে তাড়া করে এল দুর্বাসার পেছনে বিষ্ণুচক্রের মত ইংরেজদের শোষণচক্র। সোনার বাংলা হল শ্মশান। হাজার

হাজার মানুষ মরতে লাগলো অনাহারে। তথাপি দয়া হল না ইংরাজদের এবং ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষক দেশীয় ভূস্বামী ও কর সংগ্রহকারীদের। ইংরাজ তহবিল এবং নিজেদের উদর স্ফীত করার জন্য ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়ও আদায় হতে লাগল রাজকর। কোন উদার ব্যক্তি এগিয়ে এল না হতভাগাদের রক্ষা করতে। তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বিদ্রোহীরা। এদিকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির মানুষও মরিয়া হয়ে উঠলো এবং তারাও যোগদান করলো বিদ্রোহীদের সঙ্গে। দেশের সেই চরম দুঃসময়ে বিদ্রোহীদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বীর বিদ্রোহী ফকির মজনু শাহ।

ঐতিহাসিকদের মতে বিহার ও অযোধ্যার সীমান্তবর্তী মাখনপুর নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন মজনু। প্রথম থেকেই তিনি যোগদান করেছিলেন বিদ্রোহীদের দলে। পাটনায় ইংরাজ কুঠি লুণ্ঠনের সময় তিনি ছিলেন সেখানকার নেতা। তারপর বিদ্রোহীরা উত্তরবঙ্গে সংঘবদ্ধ হলে বিহারের বাসস্থান পরিত্যাগ করে চলে আসেন বাংলায় এবং বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে বসবাস আরম্ভ করেন।

তিনি বুঝেছিলেন, বিদ্রোহ বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহকে সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে মহাস্থানগড়ে নির্মাণ করেন একটি সুরক্ষিত দুর্গ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বিদ্রোহীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে তিনি এবং তাঁর দলের নেতৃস্থানীয়রা বহু ইংরাজ কুঠি এবং জমিদার বাড়ী লুণ্ঠন করেন। পথিমধ্যে জমিদারদের দ্বারা প্রেরিত ইংরাজদের রাজস্বও লুণ্ঠিত হয়েছিল। সেই সব লুণ্ঠিত অর্থের মোটা অংশ বিতরণ করা হয়েছিল বাংলা ও বিহারের বুভুক্ষু নরনারীদের মধ্যে। বাকি অংশ ব্যয় করা হয়েছিল যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্য। বিদ্রোহী দলকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেই মজনু আত্মপ্রকাশ করেন ১৭৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এই প্রথম তাঁর নেতৃত্বে প্রায় আড়াই হাজার বিদ্রোহী

সংবদ্ধ হয়। তাঁর দলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে ছুটে আসে লেঃ টেলর ও লেঃ ফেল্টহামের পরিচালিত দুই বিরাট সৈন্যদল। তাদের উপরে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন মজনু। যদিও সেই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কোন মীমাংসা হয়নি তবুও মজনুর শৌর্য বীর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল বৃটিশ সেনানায়কদ্বয়। বুঝি ইংরাজদের সাধের সিংহাসনটাও একবার কেঁপে উঠেছিল।

উক্ত যুদ্ধের পর মজনু তাঁর দলকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। প্রথমে তিনি ইংরাজদের অধীনে যে সমস্ত দেশীয় ব্যক্তি কাজ করতো এবং ব্রিটিশ সৈন্যদলে যে সব দেশী সিপাহী ছিল তাদের সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন।

বললেন—

"তোমরা আমাদের দেশের লোক। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু যারা তোমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের ধনভাণ্ডার পুষ্ট করছে, যারা তোমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করছে, তাদের তোমরা ক্ষমা করো না। দেশ তোমাদের! অত্যাচারী ইংরাজদের এদেশ থেকে হটিয়ে দিতে তোমরা আমাদের সাহাযো এগিয়ে এসো।"

কাজ হল। দেশীয় সিপাহীরা প্রতিজ্ঞা করলো, চাকরি রক্ষার জন্য তারা বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য ইংরাজ সৈন্যদের সঙ্গে আসবে। কিন্তু কোন বিদ্রোহীর কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না।

গ্রামের মানুষদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলেন মজনু। নানা স্থানে গোপনে গোপনে সভার আয়োজন করা হল। মজনু বললেন তাদের —"ইংরাজদের অত্যাচারে সোনার বাংলা আজ শ্মশান হয়ে গেছে। তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে তোমাদের। এসো, কাপুরুষের মৃত্যু বরণ না করে ঝাঁপিয়ে পড়ি ইংরাজদের উপর। যদি জয়লাভ করি তাহলে নতুনভাবে গড়ে তুলবো দেশকে।"

শেষে মজনু দেশীয় জমিদারদেরও চিঠি লিখলেন তাঁদের দলে যোগদান করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে রাণী ভবানীকে লেখা তাঁর চিঠিখানি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে রাণী ভবানী তাঁর সঙ্গে যোগদান না করলেও বিদ্রোহীদের কোন বাধা দেননি।

এইভাবে উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহের ঘাঁটিকে শক্ত করে বিহারের বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য গমন করলেন পাটনায়। তারপর কয়েকমাস প্রচার অভিযান চালিয়ে বিপুল সংখ্যক বিদ্রোহীদের নিয়ে ফিরে এলেন মহাস্থানগড়ের দুর্গে। বিশাল বাহিনীর রসদ সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত হল এখানে ওখানে কুঠি ও কাছারি লুন্ঠন। তাছাড়া মজনু জানতেন, ইংরাজদের আধুনিক সমরাস্ত্রের কাছে তাঁদের সাবেক আমলের তীর, ধনুক, বর্শা, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্র একেবারে অচল। তাই দেশীয় কামারদের দ্বারা তৈরি করালেন বন্দুক ও কামান। এবার উত্তরবঙ্গে যত ইংরাজ কুঠি ছিল সবই হল লুন্ঠিত। একটি ইংরাজও থাকল না সেখানে। আর যে সব জমিদার মজনুর ডাকে সাড়া দেয়নি তাদেরও হল চরম দুরবস্থা।

এত কাজ করতে গিয়ে মজনুর প্রয়োজন হয়েছিল প্রচুর অর্থের। তখন তিনি কৃষকদের অনুরোধ জানালেন, তারা যে পরিমাণ অর্থ ইংরাজ তহবিলে জমা দিত তা কিঞ্চিৎ যেন দান করে বিদ্রোহীদের তহবিলে। অপরদিকে ইংরাজদের রাজস্ব দিতেও বারণ করলেন। দেশের কৃষক সম্প্রদায় অম্লান বদনে রাজস্ব জমিদারদের না দিয়ে তুলে দিল বিদ্রোহীদের হাতে। মজনু এবার সদর্পে ঘোষণা করলেন—"ইংরাজ, এবার তুমি ভারত ছাড়ো।"

মজনুর নেতৃত্বে মাত্র এক বছরের মধ্যেই বিদ্রোহের লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করে ফেললো সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে। কলিকাতার ইংরাজ কর্মকর্তারা মহা দুর্ভাবনায় পড়লো। একটি পয়সাও রাজস্ব হিসাবে এল না সেখান থেকে। তখন বৃটিশ

সেনাপতি টমাস এলেন বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে। সঙ্গে এল যথেষ্ট সংখ্যক কামান।

আরম্ভ হল প্রবল যুদ্ধ। অবশেষে বিদ্রোহীরা বিশৃঙ্খলভাবে পিছু হটে পালাতে আরম্ভ করলো। ইংরাজ সৈন্যরা ভাবলো, বিদ্রোহীরা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারছে না। তখন তারা মহানন্দে বিদ্রোহীদের তাড়া করলো। কামান পড়ে রইল দূরে। বন্দুকের গুলিও তখন প্রায় নিঃশেষিত। অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ালো বিদ্রোহীরা এবং বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইংরাজ সেনাদের উপর। আর ঠিক সেই সময় পাশের গ্রামগুলি থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল তীর ধনুক ও বল্লমধারী অসংখ্য কৃষক। এদিকে যত দেশী সিপাই ছিল তারাও হাত গুটিয়ে বসে পড়লো। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল বিশাল ইংরাজবাহিনী। আর যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করলেন সেনাপতি টমাস।

এই শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছতেই স্তব্ধ হয়ে গেল ইংরাজ শাসক গোষ্ঠী। এদিকে বিদ্রোহীরাও বেপরোয়া হয়ে উঠলো। তারা জলপাইগুড়ি, বগুড়া, দিনাজপুর এবং রংপুরকে নিজেদের অধিকারে আনলো। এবার জমিদাররাও আর বিরোধীতা করতে সাহসী হল না। রাজস্ব বাবদ হাজার হাজার টাকা প্রকাশ্য ভাবে তুলে দিল বিদ্রোহীদের হাতে।

দেখতে দেখতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলায়। বৃটিশ রাজশক্তি এবার মরিয়া হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড এলেন বিদ্রোহ দমন করতে। বলা বাহুল্য এবারের আয়োজন ছিল আরও বিরাট, আরও উন্নত। কিন্তু এডওয়ার্ডের বাহিনী বিদ্রোহীদের এলাকায় প্রবেশ করতেই সমর্থ হল না। আকস্মিক ভাবে পথিমধ্যেই হল আক্রান্ত। মাত্র বার জন ইংরাজ সৈন্য প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল। নিহত হয়েছিল এডওয়ার্ডসহ বাকি সমস্ত সৈন্য।

শাসক গোষ্ঠী এবার বুঝতে পারলো, বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে পারা

যাবে না। তখন অন্য পথ অবলম্বন করলো। নতুন নতুন আইন প্রনয়ন করে জারি হল নানা বিধি নিষেধ। অপর দিকে বিদ্রোহীদের গোপন ঘাঁটিগুলির সন্ধান লাভের জন্য নিয়োগ করা হল লোক। তারা স্থানীয় জমিদার এবং জনসাধারণকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলো। কিন্তু ফল কিছুই হল না। কেউ জানালো না বিদ্রোহীদের কথা এবং নতুন নতুন আইনকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করলো।

এবার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস সাহেব একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। একরকম সামরিক আইন জারি করে বসলেন। ইংরাজ সৈন্যে ভরিয়ে দিলেন উত্তর ও পূর্ববঙ্গ। সুরু হল ব্যাপক ধর-পাকড়। বিদ্রোহী সন্দেহে যাকে তাকে এখানে ওখানে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দিতে লাগলো। গ্রামে গ্রামে হানা দিতে লাগলো অশ্বারোহী সৈন্যরা। গ্রামকে গ্রাম জ্বলতে লাগলো দাউ দাউ করে। হেস্টিংসের এক ঘোষণা অনুযায়ী নিরীহ কৃষকদের ধরে ধরে ক্রীতদাস রূপেও বিক্রি করা হল।

অন্য আরও কয়েকটা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন হেস্টিংস। ভুটানের রাজাকে ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহীদের ভুটান রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করালেন। দেশীয় সিপাহীদর বরখাস্ত করলেন সৈন্য বিভাগ থেকে। জমিদারদের উপরও জারি হল কঠোর নির্দেশ।

চরম অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে যে সব কৃষক বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতো তাদের মনোবল এবার ভেঙ্গে পড়লো। বিদ্রোহীদের মধ্যেও আরম্ভ হল কলহ। একসময় সেই কলহ আত্মহননেরও রূপ গ্রহণ করলো। ফলে আপনা হতেই স্তিমিত হয়ে গেল বিদ্রোহ। হেস্টিংস সাহেব ভাবলেন, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিদ্রোহীরা ভীত হয়ে উঠেছে। মেরুদণ্ডও ভেঙ্গে গেছে তাদের। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী- যাঁরা বিদ্রোহ দমন করতে না পারার জন্য হেস্টিংসকে দোষারোপ করেছিলেন, আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে এবার হেস্টিংস তাঁদের লিখলেন "সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান

হয়েছে। ভবিষ্যতে এই বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না।"

নায়ক মজনুশাহ ছিলেন ইংরাজদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ। তাঁর কোন হদিস না পাওয়ায় হেস্টিংস অবশ্য মনে মনে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ দু' বছর কাল যখন মজনুর কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন তিনি যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর চণ্ডনীতিকে উপেক্ষা করে আর মজনু যে বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করতে পারবেন না, এমন ধারণাও তাঁর বদ্ধমূল হল।

বীর মজনুশাহ কিন্তু চুপচাপ বসেছিলেন না। ইংরাজদের চোখে ধুলো দিয়ে বিদ্রোহের ঘাটিগুলিতে গোপনে গোপনে ভ্রমণ করছিলেন বিদ্রোহীদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছিল, তাকে মিটিয়ে ফেলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য বিহার থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বারকয়েক ছুটাছুটির পর ধীরে ধীরে মনোবল ফিরিয়ে আনলেন বিদ্রোহীদের। বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করার জন্য পুনরায় বিদ্রোহীরা মজনুর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হল সময় অতিবাহিত হল প্রায় দু বছরেরও বেশী কাল।

যে সব ইংরাজ বিদ্রোহীদের ভয়ে উত্তরবঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে গেছিল তারা তখন আবার ফিরে এসেছে পুনরায় শুরু হয়েছে শাসনের নামে নির্যাতন এবং রাজস্বের নামে প্রজা-শোষণ দেশীয় জমিদারবর্গও অতীতের দুরবস্থার কথা স্মরণ করে মহাসমারোহে প্রজাপীড়নের আয়োজন করেছে ঠিক সেই সময় অর্থাৎ ১৭৭৩ সালের শেষের দিকে তাদের কাছে খবর এল, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সেই বীর নায়ক দিনাজপুরে অবস্থান করছেন এবং তাঁর দলে আছে এক বিশাল বাহিনী ইংরাজ কুঠিগুলিতে এবং জমিদারদের প্রাসাদে প্রাসাদে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। দিনাজপুর অঞ্চলে যে সব কুঠিতে অর্থ-সম্পদ জমা ছিল সবই রাতারাতি চালান হয়ে গেল সুরক্ষিত কুঠিগুলিতে। কেবল তাই নয়, মজনু পাছে আক্রমণ করে বসেন -

এই ভয়ে সৈন্যও সমাবেশ করা হল। তবুও ইংরেজদের ভয় গেল না। অনেকেই চলে গেল নিরাপদ স্থানে।

আপাততঃ মজনু কিছুই করলেন না। কোন ইংরাজ কুঠি কিংবা জমিদার গৃহ আক্রান্ত হল না। ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও এগিয়ে এল না কেউ। শাসকবর্গ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না মজনুর মনোভাব। তখন একটা চিঠি লিখে পাঠানো হল তাঁর কাছে। অনুরোধ করা হল, মজনু যেন পুনরায় বিদ্রোহী বাহিনী গঠন না করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে যেন বসবাস করেন। প্রকারান্তরে তাঁকে আরও জানানো হল, মজনু পূর্বে যা করেছেন তার জন্য সদাশয় সরকার কোন শাস্তির ব্যবস্থা করবে না

মজনু সেই চিঠির কোন উত্তর দেননি। তবে দিনাজপুরে তাঁর ইংরাজ কুঠি লুন্ঠনের জন্য আগমন হয়নি। তিনি এসেছিলেন বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ করতে। ইংরাজদের সঙ্গে কোন বিবাদ না করে গোপনে গোপনে ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে নির্মাণ করলেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। জমা করলেন গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র। বিদ্রোহীরাও স্থান লাভ করলো দুর্গের অভ্যন্তরে।

প্রায় আড়াই বছর পরে দলকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে পুনরায় স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন মজনুশাহ। বীর বিক্রমে এখানে ওখানে ইংরাজ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপর্যস্ত করতে লাগলেন। লুন্ঠিত হল ইংরাজ কুঠি এবং জমিদারদের কাছারি। আবার সুরু হ'ল সন্ত্রাস। পুনরায় উত্তরবঙ্গ থেকে তিনি হটিয়ে দিলেন ইংরাজদের।

আবার সমর সজ্জায় সজ্জিত হল বৃটিশবাহিনী। অসংখ্য কামান ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মজনুকে দমন করতে এগিয়ে এলেন লেঃ রবার্টসন। বিশাল বৃটিশবাহিনী অতর্কিতে ঘিরে ফেললো মজনুর দুর্গকে। আরম্ভ হল প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। বিদ্রোহীরা ইচ্ছা করেই পিল পিল করে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। ক্রুদ্ধ

ইংরাজ সেনাপতি বিদ্রোহীদের কুকুরের মত গুলি করে মারার জন্য এগিয়ে দিলেন সৈন্যদের। বিজয়োল্লাসে মত্ত হয়ে ছুটল তারা। কিছুদূর গিয়েই রুখে দাঁড়ালো বিদ্রোহীরা। চললো পাল্টা আক্রমণ। রবার্টসন পারলেন না তাঁর বিশাল বাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। অধিকাংশ সৈন্য হল নিহত। তিনি নিজে প্রাণে বাঁচলেন বটে কিন্তু পঙ্গু হয়ে গেলেন চিরতরে।

ইংরাজ বাহিনীর এই শোচনীয় পরাজয়ে আবার কেঁপে উঠলো বৃটিশ শাসনের ভিত্তি। ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো শাসকবর্গ। কিন্তু সৌভাগ্য তাদের! ঠিক সেই সময় পুনরায় বিদ্রোহীদের মধ্যে আরম্ভ হল আত্মকলহ। আবার গা ঢাকা দিতে হল মজনুকে। প্রচেষ্টা চালালেন কলহ দূর করতে। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। কয়েক মাস পরে ঐ কলহ সংঘর্ষে পরিণত হল। এখানে সেখানে নিজেদের মধ্যেই শুরু হল হানাহানি। মজনু একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠলেন। শেষে মধ্যস্থতা করার জন্য ছুটতে লাগলেন বিভিন্ন ঘাঁটিতে। বগুড়াতে বিদ্রোহীদের মধ্যে আত্মসংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করলে মজনু মাত্র কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে ছুটে গেলেন সেখানে। কিন্তু কলহ দূর করতে পারলেন না, অধিকন্তু নিজেই আক্রান্ত হলেন। অধিকাংশ অনুচর প্রাণ হারাল। ভগ্ন হৃদয়ে কোন রকমে পালিয়ে এলেন সেখান থেকে।

কিন্তু হাল ছাড়লেন না মজনু। তিন বছরের আপ্রাণ চেষ্টায় তৃতীয় বারের জন্য প্রস্তুত করলেন বিদ্রোহীদের। নতুন করে বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করার জন্য এবং বিদ্রোহীদের লুপ্ত মনোবলকে ফিরিয়ে আনার জন্য পুরাদমে আরম্ভ হল লুণ্ঠন ও ইংরাজ বিতাড়ন। এমন কি ঢাকা, বগুড়া এবং ময়মনসিংহ জেলার বহু জমিদারকে কর দিতে বাধ্য করালেন।

এবার একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস। বিরাট বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করলেন পূর্ববঙ্গে। সেখানকার কালেক্টর

এবং সৈন্যাধ্যক্ষদের ভর্ৎসনাও করলেন তীব্রভাবে। দুঃখ করে বললেন, "লোকটা বছরের পর বছর ইংরাজ কুঠি লুণ্ঠন করছে, জমিদার দের কাছ থেকে কর আদায় করছে আর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সব সময় নৌকায় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ এমন অপদার্থ ব্রিটিশ বাহিনী যে, তাকে ধরতেই পারছে না।"

হেস্টিংস কলিকাতা থেকে লোক পাঠালেন বিদ্রোহীদের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য। জমিদার এবং সাধারণ মানুষকেও ভয় দেখালেন। তথাপি মজনুর কোন হদিসই পেলেন না। তাঁর সমুহ আয়োজন ব্যর্থ হওয়ার কারণ, জমিদারবর্গ ভয়ে মজনুর বিরুদ্ধাচরণ করেনি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সব সময় তিনি যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

হেস্টিংস আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। প্রেরণ করলেন আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত এক বিশাল বাহিনী বিচক্ষণ সেনানায়ক লেঃ ব্রেনানের নেতৃত্বে। ব্রেনান সম্মুখ যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করে তাঁর বিশাল বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করলেন। তারপর ছড়িয়ে দিলেন সমগ্র উত্তর ও পূর্ববঙ্গে। মজনু আদৌ ভয় পেলেন না। গোপনে গোপনে সংগ্রহ করতে লাগলেন গোলা বারুদ। নতুন বিদ্রোহীদল গঠন করতেও হলেন তৎপর। ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ল প্রচুর অর্থ ও খাদ্যের। বাধ্য হয়ে ইংরাজদের চোখে ধুলো দিয়ে লুণ্ঠন করতে লাগলেন ইংরাজদের কুঠি। কিন্তু ব্রেনানের সম্মুখীন হওয়ার নামও করলেন না।

কিন্তু ব্রেনান ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী ও তৎপর। মজনুর গতি-বিধি লক্ষ্য করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন যথেষ্ট সংখ্যক গুপ্তচর। তাছাড়া মজনুর বিরোধী যারা ছিল তাদের গোপনে গোপনে হাত করেছিলেন। ফলে একদিন উদ্ঘাটিত হল মজনুর রহস্যময় গতিবিধি।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর। ব্রেনান খবর পেলেন,

মজনু বগুড়া জেলার মুঞ্জরা নামক স্থানে সামান্য কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে অবস্থান করছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রেরণ করলেন সৈন্য-বাহিনী। এমন অতর্কিতে বৃটিশ সৈন্যরা ঘিরে ফেললো যে মজনু আর পালাবার পথ পেলেন না। আত্মসমর্পন অপেক্ষা সম্মুখ যুদ্ধকে শ্রেয় মনে করলেন মজনু এবং মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীকে নিয়ে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৃটিশ সৈন্যদের উপর। কানেশ্বর নামক স্থানে হল প্রচণ্ড লড়াই। এবারও হতভম্ব করে দিলেন সুশিক্ষিত বৃটিশ সৈন্যদের। হতাবশিষ্ট বিদ্রোহীদের নিয়ে এক সময় পলায়ন করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি স্বয়ং আহত হলেন গুরুতর রূপে।

পাছে ইংরাজদের হাতে মজনু ধরা পড়েন এই ভয়ে তাঁর অনুচরেরা রাতের অন্ধকারে স্থানান্তরিত করলেন বাংলা থেকে সুদূর বিহার সীমান্তে। কিন্তু মজনু আর সেরে উঠলেন না। মাত্র কয়েকদিন পরে মাখনপুর নামে এক অখ্যাত গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে মহান সংগ্রামী মজনু শাহের কোন তুলনা নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলে তিনিই প্রথম কুঠারাঘাত করেছিলেন। নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও তিনি তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব দান করেছিলেন সুদীর্ঘ ষোল বছর কাল। ইংরাজদের কাছে তিনি ছিলেন একটি আতঙ্ক বিশেষ, আর স্বদেশবাসীর কাছে ছিলেন পরম আত্মীয়। দেশের নিরন্ন মানুষের অন্নসংস্থানের জন্য এবং উৎপীড়িত কৃষকদের রক্ষা করার জন্য এক চরম দুঃসময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সারা জীবন ধরে তিনি চালিয়ে গেছেন সংগ্রাম। তাঁর রণকৌশলের কাছে বারে বারে হার মানতে হয়েছে দক্ষ সেনানায়কদের। সেদিন যদি শাসকদের চক্রান্তে এবং দমন-নীতির ফলে বিদ্রোহীদের মধ্যে আত্মকলহ সুরু না হত, যদি

দেশীয় জমিদারবর্গ বিদেশী বণিকদের সাহায্য না করে মজনুকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো এবং বিদ্রোহটা যদি বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত না হত তাহলে সেইদিনই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের এই মহা-নায়ক মাতৃভূমিকে বিদেশীদের কবল মুক্ত করতে সক্ষম হতেন।

তবু ভারতবর্ষের ইতিহাসে মজনুর অবদান বড় কম নয়। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব অনুপ্রাণিত করেছিল পরবর্তী কালের বিদ্রোহীদের। বলতে গেলে ১৮৫৭ সালে ভারতের বুকে যে মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তারও ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল ঐ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। পরবর্তী কালে যে মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বীর বিপ্লবীরা হাসতে হাসতে ফাঁসি বরণ করেছিলেন সেই "বন্দেমাতরম" মন্ত্র ছিল সন্ন্যাসী দলের বীজ মন্ত্র। এবং বিংশ শতাব্দীর মহান বিপ্লবী নেতাদের আদর্শস্থল ছিলেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক মজনু শাহ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মজনুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান হয়নি। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এই বিদ্রোহ বিচ্ছিন্নভাবে চলেছিল ১৮০০ সাল পর্যন্ত। মজনুর পরে বিদ্রোহকে পরিচালনা করেছিলেন মুশা শাহ, চেরাগ আলি, ফেরাগুল শাহ প্রভৃতি মজনুর শিষ্যগণ। কিন্তু মজনুর সময়ে বিদ্রোহীদের মধ্যে যে আত্মকলহ সুরু হয়েছিল তাকে ঠেকাতে কেউ পারেননি।

মজনুর মৃত্যুর পরে তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুশা শাহ বিদ্রোহীদের কিছুটা সংঘবদ্ধ করেছিলেন। কথিত আছে, বহু ইংরাজ কুঠিকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন এবং রাণী ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে ফেরাগুল শাহের হস্তে তিনি নিহত হন। দলের অপর নেতা চেরাগ আলি নিহত হন মতিগীর নামে এক বিদ্রোহী সন্ন্যাসীর হাতে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আরও কয়েকজন নায়কের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে সোভান আলি, কৃপানাথ, ভবানী পাঠক ও

দেবী চৌধুরাণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানে এঁরা বিদ্রোহীদের পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু এঁদের পতন কিভাবে হয়েছিল সে কথা জানা যায়নি।

ভবানী পাঠক প্রথম দিকে মজনু শাহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলায় বিদ্রোহীদের পরিচালনা করতেন। এঁর সঙ্গে যোগদান করেছিলেন দেবী চৌধুরাণী নামে এক মহিলা। সম্ভবতঃ দেবী চৌধুরাণী ছিলেন একজন ছোট জমিদার। ইংরাজদের উৎপীড়নে তিনি জমিদারী হারাতে বাধ্য হন এবং ভবানী পাঠকের সঙ্গে যোগদান করে সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে জোরদার করেন। উভয়ে বহু ইংরাজ কুঠি লুণ্ঠন করেন এবং জলপথে বহু পণ্যবাহী নৌকাকে লুঠ করেন। ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলায় এঁরা দুজনে ছিলেন ইংরাজদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ। লেঃ ব্রেনানের অতর্কিত আক্রমণে ভবানী পাঠক পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু দেবী চৌধুরাণীর শেষ পরিণতি কী হয়েছিল সে বিষয়ে কোন কিছু জানা যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে দেবী রাণীর যে শেষ পরিণতির চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা কাল্পনিক বলেই মনে হয়।

ভারতের ইতিহাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মত অন্য কোন বিদ্রোহ এত দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী হতে পারেনি। মজনু শাহ ও মুশা শাহের পর এই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভব হল জমিদার শ্রেণীর। তাঁদের পাইক ও বরকন্দাজ বাহিনী গ্রামাঞ্চলের ছোট-খাট বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীকে দমন করলো। তদুপরি গ্রামাঞ্চলে পুলিস বাহিনী নিযুক্ত হওয়ায় বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়লো। তাছাড়া দীর্ঘকাল বিদ্রোহ চলার ফলে বহু বিদ্রোহী শেষ পর্যন্ত বয়সের ভারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন এবং বহুজন মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ১৮০০ সালের পর আর কোন জায়গা থেকে এই বিদ্রোহের খবর ইংরাজদের কাছে আসেনি।

ত্রিপুরা বিদ্রোহের নায়ক সমশের গাজী

(১৭৬৭-১৭৬৯)

সমগ্র উত্তর ও পূর্ববঙ্গে যখন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়কগণ ইংরাজ রাজশক্তিকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিলেন ঠিক সেইসময় ত্রিপুরায় আরম্ভ হয় এক গণবিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন সমশের গাজী নামে জনৈক ক্রীতদাস।

ত্রিপুরার বিদ্রোহ বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি। মাত্র দু'বছর বিদ্রোহ চলার পর সম্মিলিত ইংরাজ ও নবাব বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করে এবং বিদ্রোহের নায়ক সমশের গাজীকে পরাজিত ও বন্দী করে বিদ্রোহের অবসান ঘটায়। তবু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এক সাধারণ ক্রীতদাস হয়েও সমশের যেভাবে ইংরাজদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাস যে সব ক্রীতদাসের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বহন করে চলেছে তাঁদের মধ্যে সমশের গাজীও অন্যতম।

এককালে ত্রিপুরা ছিল বাংলার নবাবের আশ্রিত একটি রাজ্য। ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থান পাহাড় ও অরণ্যে সমাকীর্ণ। তবে সমতল ক্ষেত্রও খুব কম নেই। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলাকে কয়েকটা চাকলায় ভাগ করেছিলেন। ত্রিপুরার ঐ সমভূমি অঞ্চলটিও ছিল একটি চাকলার অন্তর্ভুক্ত। বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন উক্ত চাকলাটির নামকরণ করেছিলেন 'রোসেনাবাদ চাকলা'। ত্রিপুরার বিদ্রোহ বলতে ঘন বসতিপূর্ণ ঐ রোসেনাবাদ চাকলারই বিদ্রোহকে বুঝায়।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মত এখানকার বিদ্রোহেরও পটভূমিকা ছিল

ইংরাজদের শাসন ও শোষণ। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাবের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলো। তৎসহ লাভ করলো রোসেনাবাদ চাকলা।

ইংরাজরা ত্রিপুরার রোসেনাবাদ চাকলার দেওয়ানী লাভ করলেও রাজাকে গদিচ্যুত করলো না। মুর্শিদাবাদের নবাবের পরিবর্তে ত্রিপুরার রাজা এবার থেকে ইংরাজদের আশ্রিত হলেন এবং মেনে নিলেন ইংরাজ নির্ধারিত নতুন ভূমি রাজস্ব। কৃষকদের উপরে কর চাপলো পূর্ব নির্ধারিত ভূমি রাজস্বের প্রায় তিন গুণের মত।

নব নির্ধারিত ভূমি রাজস্ব কৃষকদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো। রাজস্ব দিতে দিতে একে বারে ফতুর হয়ে গেল তারা। ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করলো, হালের বলদ বিক্রি করলো, এমন কি স্ত্রী-পুত্রকেও বাঁধা দিল জমিদারের কাছে। তথাপি সরকারের রাজস্ব মেটাতে পারল না। এবার ঘর দোর ছেড়ে দলে দলে কৃষক পালিয়ে গেল বনে। সুযোগ পেয়ে সেখানকার অর্থশালী জমিদাররা ক্রীতদাসের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বাড়িয়ে ফেললো।

রোসেনাবাদ এলাকায় এক প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন নাম তাঁর নাসির মহম্মদ। প্রজা শাসনে তাঁর জুড়ি বোধ হয় সেকালে কেউ ছিল না। ক্রীতদাসের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। সেই ক্রীতদাসদের মধ্যে একজন ছিলেন সমশের।

কথিত আছে, সমশের যখন নিতান্তই বালক ছিলেন সেই সময় তাঁর পিতা কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করেছিলেন নাসির মহম্মদের কাছে। একটু বয়োপ্রাপ্ত হতেই বালক বুঝতে পারলেন আপন দুর্ভাগ্যের কথা। বুঝিবা তাঁর বালক মন সেই তখন থেকেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। উপায় খুঁজেছিল সেই দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য।

কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পন করলেন বালক সমশের। তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর এবং প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির

অধিকারী। নাসির মহম্মদ তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নিয়োগ করলেন তহশীলদারের কাছে। এবার কর সংগ্রহের জন্য তাঁকে যাতায়াত করতে হল নানা স্থানে। প্রত্যক্ষ করলেন প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা। কর আদায়ের নামে প্রজাপীড়ন তাঁর বুকে শেলের মত বিদ্ধ হল। বুঝতে পারলেন, কেন তিনি আজ ক্রীতদাস। আর কেনই বা ক্রীতদাসের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নিজে ক্রীতদাস ছিলেন বলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ক্রীতদাসদের দুর্দশা ও লাঞ্ছনা। রোসেনাবাদ এলাকা থেকে ক্রীতদাসদের মুক্তিদান এবং হতভাগ্য কৃষককুলকে রক্ষার জন্য হলেন বদ্ধপরিকর।

এদিকে খাজনার হার বর্ধিত হওয়ার ফলে প্রজাদের উঠলো নাভিশ্বাস। পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নেই। তবুও যোগান দিতে হল রাজকর। যারা দিতে পারল না তাদের প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করা হল। উপায় না পেয়ে ভিটে ছাড়া হল কৃষকরা। এতদিন তাঁর বুকে বিদ্রোহের যে আগুনটা ধিকিধিকি করে জ্বলছিল, তা একদিন আত্মপ্রকাশ করলো। তহশীলদারী করতে করতে গোপনে গোপনে হাত মেলালেন উৎপীড়িত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। রাত্রির অন্ধকারে নিষ্পেষিত কৃষকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল সভার পর সভা। তিনি আহ্বান জানালেন—যারা তোমাদের মুখের গ্রাসকে কেড়ে নিচ্ছে, যারা তোমাদের বুকের রক্তে গড়ে তুলছে প্রাসাদ, যারা তোমাদের সন্তানকে জোর করে ছিনিয়ে নিচ্ছে আর রাতদিন চাবুকের ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত করছে, তোমরা তাদের ক্ষমা করো না। হে নিপীড়িত জনগণ, জেগে ওঠো! আমাদের সমবেত শক্তির কাছে ফুৎকারে উড়ে যাবে ঐ মুষ্টিমেয় সাদা চামড়া আর জমিদার গোষ্ঠী। আর তাদের কবল থেকে কৃষকদের যদি রক্ষা করতে নাও পারি তাহলেও দুঃখ নেই। নির্যাতন সহ্য করে কুকুর বিড়ালের মত বেঁচে থাকার চেয়ে বীরের মত মৃত্যু বরণ অনেক ভাল।

দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লো গ্রামে গ্রামে।

কিন্তু ঘুণাক্ষরে টের পেল না জমিদাররা। রাত হলে দলে দলে যুবক মিলিত হতো পার্শ্ববর্তী অরণ্যে। শিক্ষালাভ করতো লাঠি, তরবারী চালনা, তীর ও বর্শা নিক্ষেপ। অতি অল্পদিনেই গঠিত হল বিরাট এক বিদ্রোহীর দল। সেই সঙ্গে সুরু হল সমশেরের অভিযান।

প্রথম তিনি বিরুদ্ধাচরণ করলেন স্বীয় মনিব নাসির মহম্মদের। একদিন মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে দাঁড়ালেন নাসির মহম্মদের সম্মুখে। দাবী করলেন, প্রজাদের শোষণ করে যে পরিমাণ অর্থ তিনি সংগ্রহ করেছেন তার সবটাই বিলিয়ে দিতে হবে প্রজাদের মধ্যে---সমস্ত ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে হবে এবং বর্দ্ধিত রাজস্ব আদায় করতে পারবেন না।

প্রথমটায় নাসির মহম্মদ অবাক হয়ে গেলেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন, কোন্ শক্তির অহঙ্কারে মত্ত হয়ে পায়ের তলার মানুষ আজ বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। কিন্তু সে কেবল ক্ষণেকের জন্য। তারপর ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। নির্দেশ দিলেন, সমশেরকে বেঁধে আনার জন্য। কিন্তু কেউ ধরতে পারল না তাঁকে। সমশের নিরাপদে ফিরে এলেন তাঁর গোপন ঘাঁটিতে।

কয়েকদিন পরে সমশের একটি ছোট্ট দল নিয়ে ঘেরাও করলেন নাসির মহম্মদের প্রাসাদ। পুনরায় ঘোষণা করলেন---তাঁর সমূহ দাবীকে মেনে নিয়ে সন্ধি করতে হবে এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী দান করতে হবে তাঁর একমাত্র কন্যাকে।

এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল নাসির মহম্মদের। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাঁর বরকন্দাজ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন জীবিত কিংবা মৃত যে কোন অবস্থায় সমশেরকে ধরে আনার জন্য। কিন্তু সমশের আর অপেক্ষা করলেন না সেখানে। বরকন্দাজ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এদিকে দুর্দান্ত জমিদার নাসির মহম্মদের সঙ্গে সমশেরের

বিরোধের কথা হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত রোসেনাবাদ চাকলায়। কৃষক সম্প্রদায়ের কানে উঠলো, সমশের নামে এক ক্রীতদাস জমিদারের রক্তচক্ষুকে ভয় না করে চরম ভাবে অপমানিত করে এসেছেন। তিনি জীবন পণ করেছেন তাদের কল্যাণের জন্য। ধর্মের গোঁড়ামী তাঁর নেই, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ করেন না, আর বরদাস্ত করেন না অত্যাচারীর অত্যাচারকে। যেন রাতারাতি হিন্দুদের দেবতা এবং মুসলমানদের পয়গম্বরে পরিণত হলেন সমশের। দলে দলে হিন্দু মুসলমান ছুটে এল তাঁর কাছে। অল্পদিনের মধ্যেই বিশাল এক বিদ্রোহী বাহিনীর নায়ক হলেন সমশের।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তিনি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলেন জমিদার নাসির মহম্মদের সঙ্গে। নাসির মহম্মদও চুপ করে বসেছিলেন না। গোপনে গোপনে পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছিলেন সমশেরের শক্তির পরিমাণ। তাই পূর্ব থেকেই গঠন করেছিলেন বেশ একটা বড় রকমের বরকন্দাজ বাহিনী। উভয় পক্ষে হল তুমুল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন নাসির মহম্মদ। যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ হারালেন তাঁর পুত্ররাও। একেবারে নির্মূল করে দিলেন অত্যাচারী নাসির মহম্মদের বংশকে। তারপর তাঁর কন্যাকে ধরে এনে বিবাহ করে পূর্বের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন।

সমশেরের এ ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে পারলেন না ত্রিপুরার রাজা বিজয়মাণিক্য। নাসির মহম্মদের পতন এবং তার কন্যাকে এক সামান্য ক্রীতদাস বিবাহ করেছে শুনে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমশেরকে ধরে আনার জন্য প্রেরণ করলেন একদল সুশিক্ষিত সৈন্য। স্বয়ং মন্ত্রীর উপর ভার পড়লো সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব।

সমশের ভয় পেলেন না আদৌ। বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রিপুরেশ্বরের সৈন্যবাহিনীর উপর। দাঁড়াতে পারল না রাজার সৈন্যবাহিনী, তারা মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। উপায় না

পেয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন মহামন্ত্রী এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সমগ্র শিক পরগণার জমিদাররূপে সমশেরকে স্বীকৃতি দান করলেন।

রাজা বিজয়মাণিক্য আর সমশেরকে বাধাদান করতে সাহসী হলেন না, সত্বর উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু অল্প কিছুকাল পরে তিনি হলেন লোকান্তরিত। অতঃপর ত্রিপুরার সিংহাসন নিয়ে রাজার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাধলো বিরোধ। রাজ পরিবারের কলহের সুযোগ নিয়ে সমশের নিজেকে রোশনাবাদ চাকলার স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন এবং রাজকর দেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

সমশের জানতেন, তিনি যা করলেন তার জন্য তাঁকে উপযুক্ত মাশুল দিতে হবে। অর্থাৎ সম্মুখীন হতে হবে বড় রকমের যুদ্ধের। কিন্তু আপাততঃ কেউ এগিয়ে এল না তাঁকে বাধা দিতে। সুযোগটির সম্পুর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন তিনি। সংগ্রহ করলেন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং গঠন করলেন ছ'হাজার সৈন্যের একটি বিরাট দল। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয়েছিল বিপুল অর্থের। কিন্তু অর্থের জন্য তিনি প্রজাদের উপর কর বসালেন না। আশেপাশে যত ইংরাজ কুঠি ছিল সবই লুণ্ঠন করলেন এবং অত্যাচারী জমিদারদের শাস্তি প্রদান করে ছিনিয়ে আনলেন প্রচুর অর্থ। কৃপণ জমিদারদেরও তিনি বাদ দেননি। কথিত আছে, মাত্র একটি কৃপণ জমিদারের বাড়ী লুণ্ঠন করে লাভ করেছিলেন এক লক্ষ টাকা।

এদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে যে গোলযোগ বেধেছিল, কয়েকমাস পরে তা মিটে গেল। যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য হলেন নতুন রাজা। রাজা হয়েই তিনি প্রথম সমশেরকে সায়েস্তা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কারণ, সমস্ত চাকলাকে সমশের তখন শাসন করতে আরম্ভ করেছেন এবং এক কপর্দকও রাজকর দিচ্ছেন না।

অল্প কিছুকাল পরে তিনি একটি বড রকমের সৈন্যদল প্রেরণ

করলেন সমশেরের বিরুদ্ধে। কিন্তু এবারও ত্রিপুরার বাহিনী তাঁর সৈন্যদলের কাছে দাঁড়াতেই পারল না। অধিকাংশ সৈন্য নিহত হল। কৃষ্ণমাণিক্য দ্বিতীয়বার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু সমশের আর চুপ করে থাকলেন না। ত্রিপুরা থেকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য হলেন বদ্ধপরিকর। মাত্র মাস দুই পরে তিনি আক্রমণ করলেন ত্রিপুরার তৎকালীন রাজধানী উদয়পুর। এবারেও শোচনীয় পরাজয় বরণ করলেন কৃষ্ণমাণিক্য। রাজপরিবারের লোকজন ও হতাবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে তিনি গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করলেন আগরতলার সুরক্ষিত দুর্গে।

উদয়পুর এল সমশেরের অধিকারে। সমশের এবার মন দিলেন কৃষকদের উন্নতিতে। রাজস্বের হার পূর্বাপেক্ষাও হল কম। যারা ছিল দরিদ্র তাদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করলেন জমি এবং খাদ্য। রোশনাবাদ চাকলার যত ক্রীতদাস ছিল, সবাইকে মুক্ত করে জমি দান করলেন এবং বর্বর দাসপ্রথা নিবারণের জন্য আইন করলেন। অপরদিকে ভূমিহীন কাউকে রাখলেন না। সদ্য ভূমিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রাজস্বও মকুব করা হল।

শাসনের সুবিধার জন্য তিনি রোশনাবাদ চাকলাকে কয়েকটি পরগণায় ভাগ করলেন। প্রত্যেকটি পরগণায় নিযুক্ত করলেন একজন করে শাসনকর্তা। সমশের ছিলেন সমদর্শী রাজা। তাঁর রাজ্যে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রতিভার মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন রামধন বিশ্বাস নামে জনৈক বিচক্ষণ হিন্দু। দু'জন হিন্দু ছিলেন তাঁর প্রধান রাজস্বসচিব। তাঁদের নাম ছিল গঙ্গাগোবিন্দ এবং হরিহর।

সমাজের তথাকথিত অবহেলিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদের জন্যও তাঁর মন কেঁদে উঠেছিল। তাই তিনি তাঁর রাজ্যে নিম্ন বর্ণের লোকদের যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদাদানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। কতকগুলি ব্যাপারে সমশের অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান

করেছিলেন। তাদের মধ্যে পণ্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রধান। ইংরাজ বণিকদের কৃপায় দেশে "চোরাকারবারি" নামে বিশেষ একটি দলের উদ্ভব হয়েছিল। তারা অত্যাবশ্যক পণ্যকে মজুত করে কৃত্রিমভাবে অভাব সৃষ্টি করতো। ফলে এক এক সময় মূল্য বেড়ে তিনগুণ কিংবা চারগুণে দাঁড়াতো। ফসল উঠার সময় কৃষকরা যে মূল্য পেত, মজুতদারদের কৃপায় কয়েক মাস পরে সেই খাদ্য কৃষকদেরই কিনতে হত দু-গুণ কিংবা তিনগুণ মূল্য দিয়ে। সমশের আইন করে বন্ধ করে দিলেন চোরাকারবারি ও মজুতদারি। প্রত্যেকটি বাজারের মোড়ে মোড়ে ঝুলিয়ে দিলেন দ্রব্যের মূল্য-তালিকা। ঐ তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেকটি দোকানদারকে মাল বিক্রি করতে হত। আর মজুতদারদের বিরুদ্ধে করেছিলেন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। তাঁর আমলে প্রতি সের হিসাবে চালের দাম ছিল ১ পয়সা, ডাল ২ পয়সা, গুড় ২ পয়সা, তেল ৩ পয়সা, ঘি পাঁচ আনা, ইত্যাদি।

সমশের নিরুপদ্রবে একদিনও রাজ্যশাসন করতে পারেননি। পরাজিত ও অপমানিত রাজা কৃষ্ণমাণিক্য বার বার সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন বারেই তিনি জয়লাভ করতে পারেননি। পরিশেষে সমশেরকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলের দুর্দ্ধর্ষ কুকিদের অর্থের দ্বারা বশীভূত করে লেলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে। তাতেও সুবিধা করতে পারেননি কৃষ্ণমাণিক্য। সমশের কুকিদের দমন করেছিলেন সত্য, কিন্তু কোন কঠোর ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করেননি। প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা সরল এই পার্বত্য উপজাতির প্রতি তাঁর ছিল দুর্বলতা। তাই তিনি মন্ত্রী রামধন বিশ্বাসকে পাঠিয়েছিলেন কুকিদের বুঝিয়ে বলার জন্য। রামধন জানালেন, কুকিদের সঙ্গে তাঁদের কোন বিরোধ নেই। তাঁরাও কুকিদের মত খেটে খাওয়া মানুষ। কেবল অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে সাধারণ নিরীহ মানুষকে রক্ষা করতে কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়েছেন।

কুকিদের কাছে এবার পরিষ্কার হয়ে গেল সমশেরের আদর্শ। তারা আর বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধাচরণ করলো না। অধিকন্তু তারা সদলবলে এসে যোগ দিল সমশেরের বাহিনীতে। তারাও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো, অত্যাচারী বিদেশী শক্তিকে তারা হটিয়ে দেবে এবং অবসান ঘটাবে সামন্তশক্তির।

কৃষ্ণমাণিক্য এবার হলেন ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। প্রজারা তাঁর দিকে ফিরেও তাকায় না। সবাই সমশেরকে স্বীকার করে নিয়েছে "রাজা" বলে। তাছাড়া সমশেরের বাহিনী এমন সুগঠিত যে তার পাশে ভিড়তে পারা আর সম্ভব নয়। যতদিন সমশের বেঁচে থাকবে ততদিন তাঁকে কেউ রাজা বলে স্বীকার করবে না।

কৃষ্ণমাণিক্য অন্য কোন উপায় না দেখে ম্লানমুখে দাঁড়ালেন মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে। ফলাও করে বর্ণনা করলেন সমশেরের অত্যাচারের কাহিনী। ইংরাজদের জানালেন, সমশেরকে উচ্ছেদ না করলে ভবিষ্যতে তাদেরও বিপদের আশঙ্কা আছে।

ইংরাজেরা অবশ্য অনেক পূর্বেই পেয়েছিল সমশেরের বিদ্রোহের খবর। সমশেরের দ্বারা বহু ইংরাজ কুঠি লুন্ঠিত হয়েছে। বহু জমিদারও বসেছে পথে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় ইংরাজেরা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করেনি। এবার কৃষ্ণমাণিক্য তাদের শরণাপন্ন হওয়ায় আশ্রিতবৎসল (!) ইংরাজ সরকার অভয় দিল এবং অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এমন প্রতিশ্রুতিও দান করলো। পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে আগরতলায় ফিরে এলেন কৃষ্ণমাণিক্য।

এদিকে সমশেরের পতন ঘটানোর জন্য বিরাট আয়োজন চললো। নবাবের একটি ফৌজ এবং ইংরাজদের একটি বড় সৈন্যদল—সঙ্গে কয়েকটি হাতী এবং যথেষ্ট সংখ্যক কামান নিয়ে এগিয়ে গেল ত্রিপুরায়। সব খবর পেয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না সমশের। সিংহবিক্রমে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সম্মিলিত নবাবী ফৌজ ও ব্রিটিশ

বাহিনীর উপর। কিন্তু এবারে আর জয়লাভ করতে পারলেন না। তাঁর বিশাল বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কৌশলে সমশেরকে বন্দী করে প্রেরণ করা হল নবাব দরবারে। কোন বিচারই করা হল না। কয়েকদিন কারাগারে আটক রেখে নিদারুণভাবে তাঁকে দৈহিক যন্ত্রণা প্রদান করা হয়। অবশেষে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁর দেহকে।

সমশেরের বিদ্রোহ মাত্র দুটি বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই দুটি বছরে তিনি যা করেছিলেন, তার তুলনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সামান্য এক ক্রীতদাস থেকে নিজ প্রতিভাবলে তিনি এক স্বাধীন রাজায় পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধি। চেয়েছিলেন এক শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করতে। আর চেয়েছিলেন সামন্ততন্ত্রের পতন ও বৃটিশ রাজশক্তির উচ্ছেদ। তাঁর স্বপ্নকে সফলও করেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রবল শক্তির কাছে ভেসে যেতে হয়েছে তাঁকে। জানতেন তিনি, বৃটিশ রাজশক্তি তাকে ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করবে না দেশের জমিদার শ্রেণী। তবু তিনি এগিয়ে এসেছিলেন এবং চরম দুঃসময়ে দাঁড়িয়েছিলেন দেশের অগণিত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে। অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও হাসি ফুটিয়েছিলেন সেই সব হতভাগ্য মানুষের মুখে। এর মূল্যও বড় কম নয়। বাংলার গৌরব সমশের গাজী ইতিহাসের এক বিস্ময়!

—০—

রংপুর বিদ্রোহের নায়ক নুরুলউদ্দিন

(১৭৮৩)

রংপুর ও দিনাজপুরের ইংরাজ পৃষ্ঠপোষক ইজারাদার কুখ্যাত দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেখানকার নিরীহ কৃষক সম্প্রদায় যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, সেই বিদ্রোহ রংপুরের বিদ্রোহ নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন নুরুলউদ্দিন নামে একজন মধ্যবিত্ত কৃষক। ১৭৮৩ সালে নিপীড়িত জনগণকে সংঘবদ্ধ করে দেবী সিংহের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং এই বছরই যুদ্ধে তিনি বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু বরণ করেন। তথাপি রংপুরের বুকে নুরুলউদ্দিন যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছিলেন তাকে নিবাপিত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল বৃটিশ সরকারকে—এবং যাকে কেন্দ্র করেই কৃষকগণ বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই দেবী সিংহকে পালাতে হয়েছিল রংপুর ছেড়ে. ঘোষিত হয়েছিল জনগণের জয়।

দেবী সিংহ ছিল পশ্চিম ভারতের লোক। ভাগ্যান্বেষণে এসেছিল মুর্শিদাবাদে। বাংলার ভাগ্যবিধাতা তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা। তাদের ক্রুর শোষণযন্ত্রকে অধিকতর সক্রিয় করার জন্য রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নিযুক্ত করেছে নরপিশাচ তথা দ্বিতীয় তৈমুরলঙ মহম্মদ রেজা খাঁকে। যার চোখের চামড়া বলতে ছিল না, দেশের মানুষ হয়েও যে নিঃশেষে শোষণ করে নিয়েছিল বাংলা বিহারের সবটুকু বুকের রক্ত, যার রাক্ষুসে ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে ছিয়াত্তরে বাংলা ও বিহার বরণ করেছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষকে, সেই রেজা খাঁর পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো দেবী সিংহ। বললো, গুরুদেব একটি সুযোগ দাও আমাকে! তোমার চরণধূলির এককণা

লাভ করলে বাংলার বুকে দ্বিতীয়বার মন্বন্তরকে ডেকে আনবো আর তোমার জন্যও গড়িয়ে দেবো সোনার সিংহাসন।

দেবী সিংহকে চিনতে রেজা খাঁর ভুল হল না। মোটা টাকা উৎকোচ হিসাবে গ্রহণ করে অর্পণ করলো পূর্ণিয়া জেলার শাসনভার। মাত্র কয়েকমাসের শাসনে দেবী সিংহ পূর্ণিয়াকে শ্মশানে পরিণত করে দিল। গুরুদেব রেজা খাঁ সত্যই লজ্জা পেল তার কাছে।

কিন্তু উক্ত পদে বেশিদিন থাকতে পারল না দেবী সিংহ। তার ভয়াবহ শোষণের কথা কর্ণগোচর হতে তৎকালীন জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাকে করলেন পদচ্যুত। এই কয়েক মাসের মধ্যে ইংরাজ চরিত্র সম্বন্ধে দেবীর ভালভাবে ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাই মৃদু হেসে তৎক্ষণাৎ সে ছুটে গেল হেস্টিংস সাহেবের কাছে। পায়ের তলায় ঢেলে দিল পূর্ণিয়ার জনসাধারণের বুকের রক্ত—লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। করিতকর্মা দেবী সিংহের প্রতি দরদ উপচে পড়লো হেস্টিংসের। কিন্তু তাকে পূর্বপদে তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই রাতারাতি "প্রাদেশিক রেভিনিউ বোর্ড" নামে গঠন করলেন একটি সভা কয়েকজন তরুণ ইংরাজকে নিয়ে। আর দেবী সিংহকে নিয়োগ করলেন উক্ত সভার সহকারী কার্যাধ্যক্ষের পদে। চতুর দেবী সিংহ ইংরাজ তরুণদের কৌশলে বশীভূত করে নিজেই হয়ে উঠলো সর্বেসর্বা। রাজস্ব ছাড়াও আদায় করলো নানাবিধ কর। অপর দিকে প্রজাদের কাছ থেকে যা আদায় করলো তার এক কানাকড়িও জমা দিল না সরকারী তহবিলে। কেবল স্বনামে ও বেনামে কিনতে লাগলো জমিদারীর পর জমিদারী।

রাজস্ব জমা না পড়ায় কোম্পানীর কর্মকর্তারা কৈফিয়ৎ তলব করলো হেস্টিংসের কাছে। এবার সত্যই বড় মুস্কিলে পড়লেন হেস্টিংস। উপায় না দেখে রেভনিউ বোর্ড ভেঙ্গে দিলেন এবং দেবী সিংহকে ডাকলেন কাছে। দেবী সিংহ আদৌ দেরি করলো না। প্রচুর অর্থ নিয়ে ছুটে গেল তার আশ্রয়দাতার কাছে। সব রাগ

জল হয়ে গেল হেস্টিংসের। কিন্তু দেবী সিংহকে আর মুর্শিদাবাদে রাখতে সাহসী হলেন না। রংপুর ও দিনাজপুরের ইজারাদার নিযুক্ত করে সরিয়ে দিলেন উত্তরবঙ্গে।

এবার আর সমালোচনার কেউ থাকলো না। শুরু হল রংপুরের বুকে দেবী সিংহের অত্যাচার। ইংরাজেরা এমনিতে রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়েছিল। দেবী সিংহ বাড়ালো আরও দশগুণ। রাজস্ব হিসাবে এত অর্থ দেওয়া সম্ভব হল না সাধারণ ও মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের। বাকি পড়ল কর। আর দেবী সিংহ সেই সব কৃষকদের ধরে এনে নির্মমভাবে করলো প্রহার। লুটে নিল তাদের যথাসর্বস্ব। ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিল। কথিত আছে, কর বাকি পড়লে কৃষকদের এমন নির্মমভাবে প্রহার করা হত যে, তাতে অনেকেই মারা যেত।

জমিদারদেরও বাদ দিল না দেবী সিংহ। তাদের উপর চাপল মাত্রাতিরিক্ত কর। যারা দিতে পারল না তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনল জমিদারী, আর যারা কর দিল তারাও রেহাই পেল না। লোক ঠেকিয়ে তাদের কাছারি করলো লুণ্ঠন। ছোট ছোট জমিদার পথের ভিক্ষুকে পরিণত হল। চাষীরা চাষ ছেড়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

দেবী সিংহের অত্যাচার কিন্তু সমানে চললো। লুণ্ঠন, হত্যা, নারী ধর্ষণ কোন কিছুই বাদ পড়লো না। হয়ত সেদিন তার নিষ্ঠুরতা দেখে কবরের মধ্যে তৈমুরলঙ, নাদির শাহরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেবী সিংহের বুকে এতটুকু আঁচড় কাটেনি। বোধ হয় বিদেশী ইংরাজ বনিকদের মত তার দেহে মনুষ্য রক্ত বা চামড়া ছিল না।

অত্যাচার যখন চরমে উঠে তখন নির্বিষ সাপও ছোবল দিতে এগিয়ে আসে। রংপুর ও দিনাজপুরের মানুষও আর মুখ বুজে সহ্য করলো না। দেবী সিংহের বিরুদ্ধে আরম্ভ করলো ষড়যন্ত্র। এমনিতে তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। এবার যেখানে

সেখানে আরম্ভ করলো শলা পরামর্শ। অবশেষে সেই উৎপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন নুরুলউদ্দিন। যেন অন্ধকার খনিগর্ভ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল একখণ্ড মাণিক। অবশ্য বিপ্লবের রীতিও এই। অসন্তোষ যখন ধূমায়িত হয়ে উঠে তখন অবশ্যই একজন-না-একজন মহান নেতার আবির্ভাব হয়। নুরুলউদ্দিনের আবির্ভাব তাই আকস্মিক বলা চলে না।

ইতিহাসের অন্ধকার পৃষ্ঠা থেকে নুরুলউদ্দিনের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শুধু এইটুকুই জানা গেছে, তিনিই প্রথম রংপুরের কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন। প্রথমে তিনি অবশ্য সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চাননি। চেয়েছিলেন, ইংরাজ সরকার দেবী সিংহের অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করুক। হয়ত ভেবেছিলেন, দেবী সিংহের অত্যাচারের কথা শাসকদের কর্ণগোচর হলেই একটা ব্যবস্থা তারা অবশ্যই গ্রহণ করবে। তাই প্রথমে রংপুরের কালেক্টরের কাছে বহুজনের সহি সংগ্রহ করে একটি দরখাস্ত পেশ করলেন। দরখাস্তে তাদের দুরবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছিল। আর ছিল কতকগুলি অনুরোধ উপরোধ।

দেবী সিংহ কিন্তু লুণ্ঠিত অর্থের একটা ভাগ সব সময়ই প্রদান করতো কালেক্টরকে। তাই দরখাস্তের মূলে কোন তদন্ত হল না। তাই বাধ্য হয়ে নুরুলউদ্দিন অন্য পথ ধরলেন। বুঝতে পারলেন, অনুরোধের দ্বারা কোন কিছু হবে না। জোর করে হটিয়ে দিতে হবে দেবী সিংহকে এবং দেবী সিংহের সমর্থক রংপুরের ইংরাজ কালেক্টরকে।

নুরুলউদ্দিন এবার উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মার খেতে খেতে মানুষ এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে সবাই উন্মত্ত হয়ে উঠলো প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহায়। যেন বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ হল! দলে দলে মানুষ মিলিত হল নুরুলউদ্দিনের কাছে। একটি সভায় বিদ্রোহীরা স্থির করলো, দেবী সিংহকে তারা

আদৌ কর প্রদান করবে না। তার বদলে তারা অর্থ তুলে দেবে নূরুলউদ্দিনের হাতে। নূরুলউদ্দিন সেই অর্থে বিপ্লব পরিচালনা করবেন।

পরগণায় পরগণায় শুরু হল বিদ্রোহীদের অভিযান। ১৭৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে রংপুরে বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করলো। লুণ্ঠিত হল দেবী সিংহের অর্থ ও ইংরাজ ধনভাণ্ডার। কর আদায়কারীর সাক্ষাৎ পেলেই তাদের নির্দ্বিধায় করতে লাগলো হত্যা। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সমগ্র রংপুর জেলা বিদ্রোহীদের করায়ত্ত হল

দেবী সিংহের পৃষ্ঠপোষক কিছু কিছু জমিদারও ছিল। তারাই প্রথম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এল বিদ্রোহীদের দমন করতে। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাদের ক্ষমা করলো না। জমিদার বাড়ি ভস্মীভূত করে দিল এবং তাদের নায়েব গোমস্তাদেরও ধরে ধরে হত্যা করতে লাগলো।

দেখতে দেখতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো দিনাজপুর ও কোচবিহারে। উৎপীড়িত হিন্দু মুসলমান দলে দলে এসে যোগদান করলো নূরুলউদ্দিনের দলে। ভারি হয়ে উঠলো দল। দেবী সিংহ উপায় না পেয়ে পালিয়ে গেল এবং রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাণ্ড সাহেবের শরণাপন্ন হল। গুডল্যাণ্ড আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না বিদ্রোহীদের প্রতি। শুধু এই বিদ্রোহীরা তাদের বিশেষ কোন ক্ষতি না করায় চুপ করে ছিল।

দেবী সিংহ এসে প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দেওয়ায় গুডল্যাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলো। কর্তৃপক্ষের কাছে জানাল, নূরুল-উদ্দিন নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সমগ্র রংপুর ও দিনাজপুরে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটেছে। বিদ্রোহীরা ইংরাজদের প্রভূত ক্ষতি করছে এবং জমিদারদেরও অব্যাহতি দিচ্ছে না। অবিলম্বে এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হোক।

কালেক্টরের অধীনেও ছিল একদল সৈন্য। লে: ম্যাকডোনাল্ডের অধীনে এল আর একটি সৈন্যদল। সঙ্গে কিছু সংখ্যক কামান। ম্যাকডোনাল্ড তার বিরাট বাহিনী নিয়ে রংপুরে প্রবেশ করেই বাহিনীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দিল। যুদ্ধ না করে সুরু করলো ধর-পাকড়। সৈন্যরা যে পথ দিয়ে গেল, সেই পথে যাকে দেখতে পেল তাকেই হত্যা করলো। শিশু ও নারীর প্রতি অত্যাচার করতেও তারা বাদ দিল না। জ্বালিয়ে দিতে লাগলো গ্রামের পর গ্রাম।

ম্যাকডোনাল্ডের সৈন্যবাহিনীর এই অত্যাচার বিদ্রোহীরা নীরবে সহ্য করলো না। ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃটিশ সৈন্যের উপর। এখানে ওখানে চলতে লাগলো খণ্ডযুদ্ধ। সেই যুদ্ধগুলিতে কখন বিদ্রোহীরা জয়লাভ করলো কখন বা বরণ করলো পরাজয়। অবশেষে বিদ্রোহীরা নুরুলউদ্দিনের নেতৃত্বে আক্রমণ করলো মোঘলহাট বন্দরে ইংরাজ কুঠি। এই কুঠিটি ছিল রংপুরের ইংরাজ শক্তির মূল কেন্দ্রগুলির অন্যতম।

কিন্তু বিদ্রোহীদের আধুনিক সমরাস্ত্র ছিল না। ছিল না ইংরাজ সৈন্যের মত সুশিক্ষিত পদ্ধতি। তাই যুদ্ধে বিদ্রোহীদেরই হল পরাজয়। নুরুলউদ্দিনের সহকারী দয়াশীল নামে এক কৃষকনেতা মৃত্যুবরণ করলেন এবং নুরুলউদ্দিন গোলার আঘাতে হলেন গুরুতররূপে আহত। ইংরাজেরা তখন বন্দী করলো তাঁকে। কিন্তু নুরুলউদ্দিন ইংরাজদের বিচার করার সুযোগ দিলেন না। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বরণ করলেন মৃত্যুকে।

• নুরুলউদ্দিন যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত হয়নি। বরং তাঁর মৃত্যুতে বিদ্রোহীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। নুরুলউদ্দিনও জানতেন, যে আগুন তিনি জ্বেলে দিলেন তাতে নিজেকেই আগে পুড়ে মরতে হবে। তাই তিনি

বলে গেছিলেন, "আমার মৃত্যুতে যেন বিদ্রোহের অবসান না হয়। প্রাণ থাকতে ক্ষমা করো না অত্যাচারীদের। আর রাজকোষে জমা দিও না এক কপর্দকও।"

বিদ্রোহীরা তাদের নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সম্মুখ যুদ্ধে তারা অবতীর্ণ হয়নি বটে কিন্তু শত অত্যাচার সত্ত্বেও রাজস্ব দিতে স্বীকার করেনি। ফলে একমাত্র রংপুরেই বাকি পড়লো চার লক্ষ টাকার মত রাজস্ব।

এবার টনক নড়লো কোম্পানীর। কর্তৃপক্ষ প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও রাজস্ব আদায়ের জন্য কমিশনার নিযুক্ত করে পাঠালো পিটারসন নামে এক ইংরাজ কর্মচারীকে।

সব ইংরাজ কর্মচারীদের চরিত্র এক ছিল না। ব্যতিক্রমদের মধ্যে পিটারসন ছিলেন একজন। রংপুরে পা দিয়েই তিনি শিউরে উঠলেন। একি করেছে দেবী সিংহ? গ্রামে লোকজন নেই বাজার হাট বসে না। কৃষকেরা চাষবাস করছে না। যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর কেবল চোখে পড়ে সারি সারি ভস্মীভূত কুটির। মনুষ্যত্বের এই চরম অবমাননা দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পিটারসন। তীব্র ভাষায় তিনি প্রতিবাদ জানালেন।

কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে সক্ষোভে জানালেন—দেবী সিংহ যা করেছে, পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তা ঘটেনি। এই অবস্থায় প্রজারা বিদ্রোহ না করে যদি রাজস্ব প্রদান করতো তাহলেই আমি আশ্চর্য বোধ করতাম।

দেবী সিংহ এবং রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাণ্ড সাহেবকে এবার কলিকাতায় তলব করা হল। উপায় না পেয়ে আপন কুকীর্তিকে ঢাকা দেওয়ার জন্য দেবী সিংহ কলিকাতায় ছুটে গেল ৭০ লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে। ঐ টাকা বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ভাগ করে দিল দেবী সিংহ।

তখন বিচারের নামে হল প্রহসন। রায় দিল— দেবী সিংহ ও

গুডল্যাণ্ড সাহেবের কোন দোষ নেই। ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে পিটারসন সাহেব ওদের নামে মিথ্যা রিপোর্ট করেছেন।

কিন্তু দেবী সিংহের আর ফিরে আসা সম্ভব হল না। একদিকে দেবী সিংহের আশ্রয়দাতা হেস্টিংস সাহেব দেশে ফিরে গেলেন। তাঁর বদলে গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড কর্নওয়ালিশ। অপরদিকে টাকা খেয়ে বিচারকমণ্ডলী দেবী সিংহকে নির্দোষ প্রমাণ করলেও তার প্রতি কর্তৃপক্ষের আস্থা আদৌ ছিল না। তবুও দেবী সিংহ চেষ্টা করেছিল কর্নওয়ালিশকে ভজনা করতে। সুবিধা না হওয়ায় মুশিদাবাদে তার বিরাট জমিদারীতে ফিরে গেল। এইখানেই রংপুরের বিদ্রোহের ঘটলো অবসান। তবে শোষণমুক্ত তারা হতে পারেনি। কর্নওয়ালিশের দশশালা বন্দোবস্ত শোষণের আর একটি নতুন দ্বারের উদ্ঘাটন করে এবং বাংলার কৃষককুলকে নানা সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়।

—:—

মেদিনীপুরের চোয়াড় বিদ্রোহের নায়িকা রাণী শিরোমণি

(১৭৯৮-১৭৯৯)

মুঘল আমলে বাংলায় বহু জমিদার ছিলেন। তবে তুলনামূলক ভাবে জমিদারের সংখ্যা মেদিনীপুরেই ছিল বেশি। এই সব জমিদাররা ছিলেন অনেকটা স্বাধীন। তাঁরা সৈন্য সামন্ত ও পাইক বরকন্দাজ রাখতেন, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনও করতেন। আর বছরের শেষে কিছু কর সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিতেন। বিপদের সময় সম্রাটকে সাহায্যও করতেন সৈন্যদল প্রেরণ করে। অনেকটা সামন্ত-রাজদের মতই

মুঘল আমলের শেষের দিকে বাংলায় আরম্ভ হয় বর্গীর হাঙ্গামা। বর্গীরা উড়িষ্যা হয়ে বাংলায় প্রথম মেদিনীপুর জেলায়ই প্রবেশ করতো। ফলে বর্গী-হাঙ্গামায় মেদিনীপুরই হয়েছিল সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। এখানকার জমিদারদেরও তাই রাখতে হয়েছিল যথেষ্ট সৈন্য ও পাইক। তাহলেও বর্গীদের অত্যাচার ঠেকাতে পারেনি। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যা, রঘুজী ভোঁসলার প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনাগুলির ধাক্কায় নিষ্পেষিত হয়েছিল মেদিনীপুর। বলতে গেলে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত চলেছিল বর্গীদের অত্যাচার। তারপর মীরকাশিম যখন নবাবী পেয়ে মেদিনীপুরের শাসন ক্ষমতা ইংরাজদের হস্তে অর্পণ করলেন তখন চ্যাপমান সাহেব বর্গীদের হটিয়ে দিয়ে হাঙ্গামা থেকে মুক্ত করলেন মেদিনীপুরকে। সেই সঙ্গে একটা নতুন আতঙ্কের সৃষ্টি করলো ইংরাজ সরকার। সেই আতঙ্ক হল অতিরিক্ত পরিমাণ কর বৃদ্ধি।

ইংরাজদের প্রথম দৃষ্টি পড়লো জমিদারদের উপর। বর্গী হাঙ্গামা

দমন করতে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছিল তার দশগুণ অর্থ উশুল করার জন্য তারা জমিদারদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবী করে বসলো। এমনিতে দীর্ঘকাল বর্গী হাঙ্গামা চলতে থাকায় অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। তার উপর এই বাড়তি টাকা। জমিদারদের মধ্যে ধীরে ধীরে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো।

অপরদিকে জমিদাররা যে সব পাইক রাখতেন, তাদের বেতন দিতেন না। পাইকরা বংশানুক্রমে কিছু কিছু নিষ্কর জমি ভোগদখল করে আসতো। ইংরাজেরা বাড়তি আয়ের জন্য নিষ্কর জমি আর রাখলো না। পাইকদেরও বাধ্য করালো কর দিতে। ফলে পাইকরাও ক্ষেপে উঠলো। জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন।

মেদিনীপুরের এই বিদ্রোহকে চোয়াড় বিদ্রোহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু কেন যে উক্ত নামকরণ, সেকথা ভালভাবে জানা যায় না। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ঐ চোয়াড় শব্দটির দ্বারা নিম্ন বর্ণের মানুষ, আদিবাসী ও দুর্বৃত্তদের নির্দেশ করতে চেয়েছিল তৎকালীন ইংরাজেরা ও ইংরাজ পৃষ্ঠপোষক জমিদার গোষ্ঠী। তাই এই বিদ্রোহের তারা নামকরণ করেছিল "চোয়াড় বিদ্রোহ"। এটি এমন একটি গণবিদ্রোহ যা সন্ন্যাসীবিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালের সাঁওতাল বিদ্রোহকেও হার মানায়। এই একটি মাত্র বিদ্রোহ, যার কাছে বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করেছিল প্রবল প্রতাপশালী ইংরাজ রাজশক্তি। মেনে নিয়েছিল বিদ্রোহীদের দাবীকে। অথচ ইতিহাসে স্থান লাভ করেনি উক্ত বিদ্রেহের কাহিনীটি।

জমিদার ও পাইকদের অসন্তোষ যখন ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল, সেই সময় বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, মেদিনীপুরের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল এবং মানভূম জেলার পূর্বাঞ্চল একত্রে 'জঙ্গল মহলে'র আদিবাসীরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এইসব অঞ্চল ছিল বনে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অরণ্যচারী আদিবাসীরা আদিমকাল থেকে আদিম প্রথায় চাষবাস করে আসছিল। তারা কোন খাজনা

দিত না। বাহিরেও আসতো না বড় একটা। ক্ষেতের ফসল, বনের ফল ফুল পাতা, শিকার করা পশু মাংস, এই নিয়ে স্বাধীনভাবেই তারা বসবাস করতো। মেদিনীপুরের শাসন ক্ষমতা লাভ করে জঙ্গল মহলের যে সব জায়গা আদিবাসীরা পরিষ্কার করে চাষবাস করতো, সেই সব জায়গা সরকার উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করলো জমিদারদের। আদিবাসী তথা ইংরাজ কথিত চোয়াড়রা (?) পুরুষানুক্রমে দখলীকৃত জমি থেকে হল বঞ্চিত। যারা চাষবাস করলো তাদের কাছ থেকে বর্বর প্রথায় আদায় করা হল কর। চোয়াড়দের এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বেরিয়ে এল তীর, ধনুক, লাঠি, টাঙ্গি প্রভৃতি আদিম যুগের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

ইংরাজেরা অবাধ শোষণের রথ মেদিনীপুরের বুকে চালিয়ে যেতে থাকলেও প্রথমে কেউ বিদ্রোহী হতে সাহসী হয়নি। একমাত্র বাড়তি খাজনা নিয়ে প্রথম কলহ করেছিলেন ময়নাগড়ের রাজা প্রথম বাহুবলীন্দ্র। অতঃপর কলহ বাধে রায়পুর পরগণার জমিদার দুর্জন সিংহের সঙ্গে। অধিক রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় ইংরাজেরা তাঁর কাছ থেকে জমিদারী ছিনিয়ে বিক্রি করে দিল অপর এক জমিদারকে। তাই দুর্জন সিংহ সাহায্য ভিক্ষা করলেন চোয়াড় ও পাইকদের। উত্তেজিত হয়ে উঠলো পাইক ও চোয়াড়রা। দলে দলে প্রবেশ করলো রায়পুর পরগণায় এবং নতুন জমিদারকে বিতাড়িত করে নিজেরাই অধিকার করলো জমিদারি। তারপর রায়পুর পরগণায় যত তহশিলদার ছিল তাদেরও দিল তাড়িয়ে। এইভাবে হল প্রথম বিদ্রোহের বহিঃ-প্রকাশ। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে—যদিও বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে। সেদিন ঘাটশিলার মহান ও অতি বৃদ্ধ এক জমিদার চোয়াড়দের সংঘবদ্ধ করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি জয়লাভ করতে। আর তাঁর পরাজয়ের পরই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল বিদ্রোহ।

এরপর দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্রোহ। ঐ বছর মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। শালবনী, বাসুদেবপুর, রামগড়, ডুবাজল, তূর্কচের, বলরামপুর, কাশীজোড়া, তমলুক, জলেশ্বর, জাতিবুনি ও মেদিনীপুর সদরে।

চতুর্দিকে আরম্ভ হয়ে গেল ধ্বংসকাণ্ড। চোয়াড়রা চকিতে কোথায় চাষীদের পাকা ধান কেটে নিয়ে গেল, কোথায় জমিদারদের নায়েব ও গোমস্তাদের করলো হত্যা। লুন্ঠিত হতে লাগলো গ্রামের পর গ্রাম। প্রতি রাত্রিতে তারা দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসতো, গ্রামবাসীরা বাধা দিতে এলে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত এবং মশালের আগুনে দগ্ধ করতো। সিপাহী, তহশীলদার অথবা কোন সরকারি কর্মচারীকে দেখতে পেলেই মার মার করে এগিয়ে আসতো এবং নির্মম ভাবে হত্যা করতো। আর যে সমস্ত জমিদার তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতো তাদেরও সহজে নিষ্কৃতি দিত না।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল মেদিনীপুর পরগণাটি। পাশে শালবনী ছিল বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা। ঐখানেই ইংরাজ বলপূর্বক পাইকদের উচ্ছেদ করেছিল। তাই ক্রুদ্ধ আক্রোশে একেবারে তছনছ করে দিল শালবনী। আর মেদিনীপুর শহর ছিল সরকারি কর্ম্মচারীদের আবাসস্থল। উক্ত কারণে শহরকেও জনশূন্য করে দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো বিদ্রোহীরা। মেদিনীপুর শহর এবার কাঁপতে লাগল আতঙ্কে থরথর করে।

কালেক্টর সাহেব দিশেহারা হয়ে উঠলেন। রেভিনিউ বোর্ডকে লিখলেন, মেদিনীপুরের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। পুলিশ, দারোগা, তহশিলদার, সরকারী কর্মচারী থেকে গ্রামের মানুষ পর্যন্ত কেউ রক্ষা পাচ্ছে না চোয়াড়দের হাত থেকে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কুঠি কাছারি হচ্ছে লুন্ঠিত। প্রাণের দায়ে ছুটাছুটি করছে মানুষ। শোনা যাচ্ছে, মেদিনীপুর শহরও তারা আক্রমণ করবে।

কালেক্টর সাহেব অবশ্য চুপ করে বসেছিলেন না। বিদ্রোহ

দমনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তাঁর সিপাহীর দল কিছুই করতে পারেনি। অধিকাংশ সিপাহীকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। তাছাড়া বিদ্রোহীদের গতিবিধি নির্ণয় করার কোন উপায়ও ছিল না। যখন তখন যেখানে সেখানে হানা দিত। কৃষকদের গরু মহিষ ধরে নিয়ে যেত, ধানের মরাই লুঠ করতো, এমন কত কি। তাই সাধারণ মানুষও উৎপীড়িত হয়েছিল। কালেক্টর সাহেব গ্রামবাসীদের রক্ষার জন্য বারে বারে সিপাহীর ফৌজ প্রেরণ করেও ব্যর্থ হলেন। এবার তাঁদের আতঙ্ক উপস্থিত হল।

কালেক্টরের চিঠি পেয়ে সৈন্যদল এল। কিন্তু গোয়াড়দের কিছুই করতে পারল না। তারা দিনের বেলায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো এবং রাত্রিতে হানা দিত। গাঁয়ের মানুষ এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিল না। অতএব ধরপাকড় করে কথা আদায় করবে কেমন করে?

ইংরাজেরা বিদ্রোহ দমন করতে না পেরে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করতে আরম্ভ করলো। কেবল মেদিনীপুর শহরটাকে সংরক্ষিত করে বুঝতে চেষ্টা করলো, বিদ্রোহীদের শক্তি কোথায়? শেষে স্থির করলো, কিছু সংখ্যক দেশীয় জমিদারই ওদের মদৎ দিচ্ছে। তখনই দৃষ্টি পড়লো কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির উপর।

মেদিনীপুর শহরের উত্তর পূর্ব দিকে মাত্র ছ' মাইল দূরে কর্ণগড়। এখানকার রাজার নাম ছিল অজিত সিংহ। তাঁর ছিল দুই রাণী। রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা যাওয়ায় বড় রাণী ভবানী কিছুকাল জমিদারী পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনিও বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ফলে ১৭৬০ সালে ছোট রাণী শিরোমণি জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী অপর দিকে তেমনই ছিল তাঁর প্রচণ্ড সাহস।

কর্ণগড়ের জমিদারীর কাজ দেখাশোনা করতো নায়েব যুগলচরণ। লোকটা ছিল অতিশয় ধূর্ত। একটি মহিলার আধিপত্যকে স্বীকার

করতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। রাণীকে সরিয়ে জমিদারী হস্তগত করতে লিপ্ত হ'ল জঘন্য ষড়যন্ত্রে। শিরোমণি বুঝতে পারলেন সব কথা। তথাপি অত্যন্ত পুরানো লোক এবং জমিদারীর সব কিছু তার নখদর্পণে বলে তাকে ঘাঁটাতে সাহস করলেন না। গোপনে গোপনে নবাগত ইংরাজদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চললেন। অথচ এই বহিরাগতদের তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না।

প্রথম যখন ঝাড়গ্রাম ও ঘাটশিলার জঙ্গল মহলে চোয়াড়দের উৎপাত সুরু হয়েছিল, তখনই ফার্গুসন সাহেব এসেছিল বিদ্রোহ দমন করতে। বন্ধুত্বের শর্ত অনুযায়ী শিরোমণির কাছে চেয়েছিল একদল পাইক। বিদ্রোহীদের প্রতি শিরোমণির আন্তরিক সমর্থন থাকলেও তিনি সরাসরি না বলতে পারেননি। প্রেরণ করেছিলেন একদল পাইক। তবে পাইকদের খরচের জন্য একটা মোটা অঙ্কের টাকা দাবী করেছিলেন। ফার্গুসন সাহেব অর্থ দিতে স্বীকার করেছিল বটে—কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর রাণীর কথায় আদৌ কর্ণপাত করলো না সে।

রাণী কিন্তু ছাড়বার পাত্রী ছিলেন না। বার বার টাকা চেয়ে যখন নিষ্ফল হলেন তখন সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তারপর ইংরাজদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী পাইক ও চোয়াড়দের সংঘবদ্ধ করলেন।

১৭৯৮ সালেই বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে এবং এই সময়ই রাণী একত্রিত করেন বিদ্রোহীদের। বিভিন্ন সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায়, বিদ্রোহীরা এই সময় রাণী শিরোমণির নামে কতকগুলি ভীতিসূচক পত্র জমিদারদের মধ্যে বিলি করতে থাকে। জমিদারদের অনেকে রাণী শিরোমণির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বলেও মনে হয়। ফলে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেই রাণী শিরোমণি ১৭৯৯ সালের দিকে সরাসরি ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

রাণী ভালভাবেই জানতেন, উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরাজ

সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি অন্য অবস্থা গ্রহণ করেন। এক বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে ঘোষণা করেন, কেউ যেন ইংরাজ সৈন্য প্রবেশ করলে তাদের খাদ্য সরবরাহের ভার গ্রহণ না করে। পত্রের দ্বারা প্রতিটি জমিদার, তহশীলদার, দোকানদার, ইজারাদার প্রভৃতিকে সাবধান করে দেন এবং ভীতি প্রদর্শনও করেন।

রাণী শিরোমণি বিদ্রোহীদের পরিচালনা করার পর থেকে বিদ্রোহ অন্যরূপ পরিগ্রহ করলো। অযথা গ্রামবাসীদের উপর আর অত্যাচার হল না। রাণীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন সর্দার মোহনলাল। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে গমন করতেন।

রাণী শিরোমণি আবার ছিলেন খুব বড় জমিদার—কেবল কর্ণগড় নয়—ঝাড়গ্রাম, নাড়াজোল প্রভৃতি অঞ্চলও তার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করতেন প্রজাদের। তাই প্রজারা ছিল তাঁর অত্যন্ত অনুগত। অপরদিকে চোয়াড় ও পাইকেরা তাঁকে মায়ের মতই ভক্তিশ্রদ্ধা করতো। ছোট ছোট জমিদাররা ভয়ে মেনে নিয়েছিল রাণীর নির্দেশ। তাঁর বিশাল বাহিনীর কথা স্মরণ করে কেউ টুঁ শব্দটি করতে সাহসী হল না। কয়েকটা মাসের মধ্যেই তিনি মেদিনীপুরের বিরাট এক অঞ্চলকে ইংরাজ শাসন থেকে মুক্ত করে ফেললেন। তাঁর সুশাসনে গ্রামের সাধারণ মানুষও এবার এসে দাঁড়ালো তাঁর পাশে।

রাণী এত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইংরাজ সৈন্যবাহিনী একদিন অবরোধ করলো তাঁর কর্ণগড় ও আবাসগড় নামক দুর্গ দুটি। যদিও রাণী অনেক আগে থেকে হাজার হাজার বিদ্রোহীকে দুর্গ রক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তবুও ওদের কামানের কাছে বিদ্রোহীরা কিছুই করতে পারল না। রাণীকে ইংরাজরা গ্রেপ্তার করলো। তারপর দুর্গ দুটি ইংরাজ নিজ অধিকারে রাখলো। কিন্তু বাহির থেকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতে না পারায় বাধ্য হয়ে

পলায়ন করতে হল সৈন্যদের। আর তৎক্ষণাৎ দুর্গ দুটি অধিকার করে নিল বিদ্রোহীরা।

রাণী শিরোমণি আর কর্ণগড়ে ফিরে আসেনি। ইংরাজরা তাঁকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে যায় কলকাতায়। কয়েক বছর পরে মেদিনীপুর কোর্টে তাঁর বিচার হয়েছিল। হয়ত নারী বলেই কৃপা করে আদালত মুক্তি দিয়েছিল তাঁকে। তখন তাঁর সাধের কর্ণগড় আর নেই। ইংরাজেরা একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। রাণী সে শ্মশানে আর ফিরে গেলেন না। লোকালয় থেকে দূরে একটি কুটির নির্মাণ করে বসবাস আরম্ভ করলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে এই বীর রমণীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে।

মেদিনীপুরের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী রাণী শিরোমণি। চাঁদসুলতানা রাণী দুর্গাবতী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বীরাঙ্গনাদের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে আজও তিনি অবহেলিত হয়ে আছেন।

শিরোমণির গ্রেপ্তারের পর বিদ্রোহের অবসান হয়নি। বরং আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল চোয়াড়রা। বারবার সৈন্যদল প্রেরণ করে এবং মেদিনীপুরকে সৈন্যে ভরিয়ে দিয়েও কোন সুবিধা করতে পারেনি কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ। এত প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্র প্রেরণ এবং সামরিক শাসন জারি সত্ত্বেও বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হল না দেখে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের গভর্ণরও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। খোঁজ নিয়ে বুঝতে পারলেন দুর্দ্ধর্ষ চোয়াড় ও পাইকদের জমি বেদখল করার জন্যই এই অবস্থা। তখন তিনি রেভিনিউ বোর্ডের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন এবং অবিলম্বে তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন।

•রেভিনিউ বোর্ড বুঝতে পারলো, পাইকদের ও চোয়াড়দের জমি থেকে উচ্ছেদ করা ভুল হয়েছে। তারা ভাবতে পারেনি—এত বড় কাণ্ড বাধাবে অরণ্যের ঐ আদিবাসীরা। মেদিনীপুরের কালেক্টরও

অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও পরামর্শ দান করলেন নামে মাত্র খাজনায় পাইকদের জমি ফেরত দিতে।

কিন্তু এত সহজে নতি স্বীকার করে নিল না বৃটিশ সরকার। যে নীতিতে সে ছিল একেবারে পাকা এবং শেষ দিন পর্যন্ত যে নীতি সে প্রয়োগ করেছিল, সেই ভেদনীতির প্রয়োগ করল এবার। প্রথমত যে জমিদার শ্রেণী ইংরাজদের উৎপীড়নে গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতো তাদের দান করলো অভয়। কিন্তু শর্ত আরোপ করলো, তাদের বিদ্রোহীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। তাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হল, তাদের নিজ নিজ এলাকায় যে সব অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক বাস করে তাদের সর্দারের নাম এবং পাইকদের নাম সংগ্রহ করে যেন অবিলম্বে জেলাশাসকের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত পাইক ও চোয়াড়দের মধ্যে তারা বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। ইংরাজেরা খবর সংগ্রহ করেছিল, পাইকদের শক্তির একটা বড় উৎস জঙ্গল মহলের আদিবাসী সম্প্রদায়। এমনিতে তারা অত্যন্ত সরল এবং নিরীহ কিন্তু রেগে উঠলে তারা জীবন পণ করে লড়াইতে মেতে উঠে। তারা মরবে কিন্তু নতি স্বীকার করবে না। সরকার কিছু কিছু জমি নামেমাত্র খাজনায় পাইকদের মধ্যে বিলি করলো আর তাদের নিয়োগ করলো চৌকিদার ও পুলিশের পদে। এখানেও শর্ত আরোপিত হল, চোয়াড়দের সঙ্গে তারা মিশতে পারবে না। তাছাড়া চোয়াড়দের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবও তাদের ভেতরে জাগিয়ে তোলা হল।

এদিকে চোয়াড়দের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করলো সরকার অর্থের ও পদের দ্বারা বশীভূত করলো চোয়াড় সর্দারদের। খবর নিয়ে ইংরাজেরা বুঝেছিল, এক একজন সর্দারদের অধীনে থাকে কম করে অন্তত তিন-চার শ' চোয়াড়। যদি ঐ সর্দারদের বশীভূত করা যায় তাহলে বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। তাই জঙ্গল মহলের জমিদারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলো সর্দারদের

নাম। তারপর সর্দারদের পুলিশের কাজে নিয়োগ করলো। তারা লাভ করলো অর্থ ও সম্মান। খুশি হয়ে তারা স্বীকার করলো সরকারের আনুগত্য। তাছাড়া হাড়ি, ডোম, বাউরি, বাগদি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের সর্দারদেরও বশীভূত করলো অর্থ ও পদের বিনিময়ে।

এত করেও দুর্দ্ধর্ষ চোয়াড়দের ভীতি দূরীভূত হয়নি শাসকদের মন থেকে। তাই তৎকালীন মেদিনীপুরের জঙ্গল মহল তথা দুর্গম বনাঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি পৃথক জেলা গঠিত হল। তার শাসক নিযুক্ত হল একজন জবরদস্ত ইংরাজ। তার এবং আত্মবিক্রয়কারী সর্দারদের প্রচণ্ড শাসনে চোয়াড়রা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে পড়ে। সেই জঙ্গল মহলই বর্তমানের বাঁকুড়া জেলা।

চোয়াড় বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দখলিকৃত জমির অধিকার নিয়ে যেভাবে তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং পুনরায় অর্জন করেছিল সে অধিকার—তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক সংগ্রামগুলির অন্যতম হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সংগ্রাম আজও পর্যন্ত মেদিনীপুরবাসীকে প্রভাবিত করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

—· ·

মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহের নায়ক
অচল সিংহ

(১৮০৬-১৮১৬)

চোয়াড় বিদ্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর মেদিনীপুরের বগড়ী পরগণায় যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে সেই বিদ্রোহ নায়েক বিদ্রোহ নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে নায়েক বিদ্রোহ পাইক বিদ্রোহেরই নামান্তর।

বগড়ী (বর্তমানে গড়বেতা) অঞ্চলে জমিদাররা যে সমস্ত পাইক-বরকন্দাজ পালন করতেন তাদের নায়েক বলা হত। এই নায়েকরাও ভোগ করতো নিষ্কর জমি। পরিবর্তে জমিদারের বিপদ আপদে ছুটে আসতো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতো প্রাণপণে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের যেমন খাজনার পরিমাণ বাড়লো তেমনই যত প্রকারের জমি ছিল রেহাই না দিয়ে সবই জমিদারদের বন্দোবস্ত দেওয়া হল। গড়বেতার নায়েকরাও বাদ পড়ল না। তারাও হারালো দখলিকৃত নিষ্কর জমি।

বগড়ীতে উক্ত বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ১৮০৬ সালে। রাজা ছত্রসিংহ বর্ধিত কর দিতে অস্বীকার করায় তার জমিদারি জোর করে দখল করা হয় এবং অপর এক জমিদারকে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

ছত্রসিংহ এভাবে গদিচ্যুত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং নায়েকদের সাহায্যে জমিদারি পুনর্দখলের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ছত্রসিংহ ছিল লোভী, স্বার্থপর ও শয়তান। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ছিল

তার প্রচেষ্টা। নায়েকদের স্বার্থের দিকে তার আদৌ লক্ষ্য ছিল না, একরকম উপায়ান্তর না পেয়ে যোগদান করেছিল নায়েকদের দলে।

বিদ্রোহীদের প্রকৃত নায়ক ছিলেন অচলসিংহ নামে এক বীর বিদ্রোহী। প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে বিদ্রোহীদের পরিচালনা করেছিলেন এবং যে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যই বড় বিস্ময়কর। তাঁর দুর্জয় সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে বারবার নাজেহাল হতে হয়েছিল ইংরাজ শক্তিকে। শেষ পর্যন্ত ভেদবুদ্ধি প্রয়োগ করেই ধরতে হয়েছিল তাঁকে। অচলসিংহ এক শ্রেষ্ঠ নেতা এবং বিপ্লবীদের আদর্শস্থল।

অচলসিংহের প্রধান ঘাঁটি ছিল বগড়ী পরগণার "গনগনির ডাঙা"। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া যাওয়ার পথে পড়ে শিলাবতী নদী। শিলাবতীর দক্ষিণেই ছিল ঐ গণগনির ডাঙা। সেকালে এখানেও ছিল গভীর বন। এখন বনের চিহ্নমাত্র নেই। কিংবদন্তী আছে, এই বনে বাস করতো বকরাক্ষস। অজ্ঞাতবাস কালে আশ্রয়-দাতা ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করতে জননীর আদেশে মধ্যম পাণ্ডব এইখানেই হত্যা করেছিলেন বকরাক্ষসকে। স্থানীয় লোকে তাই উক্ত ডাঙাকে আজও বলে "বকদ্বীপ"। অচলসিংহ সেই বকদ্বীপকে কেন্দ্র করেই সম্প্রসারিত করেছিলেন বিদ্রোহকে।

অচলসিংহের পূর্ববর্তী জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য লাভ করা যায় না। তিনি হয়ত বগড়ীর রাজবংশের কেউ ছিলেন। যৌবনে তিনি যোগদান করেছিলেন ঐ বগড়ীর রাজার সেনাবিভাগে। তাই তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন বিদ্রোহীদের প্রকৃষ্ট পরিচালনায়।

নায়েকরা ভূমিহীন হওয়ায় এবং ছত্রসিংহ বিতাড়িত হওয়ায় তিনিও অসন্তুষ্ট হলেন। পাইক তথা চোয়াড় বিদ্রোহের আগুন তখনও সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হয়নি। অচলসিংহ সেই চোয়াড় বিদ্রোহের

আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন এবং বগড়ীর সমস্ত নায়েকদের একত্রিত করলেন। তারপর সুরু হল প্রশিক্ষণ। অপরদিকে গদিচ্যুত রাজা ছত্রসিংহের সেনাবাহিনীকেও তিনি লাভ করলেন। ফলে কয়েক মাসের মধ্যে গঠন করলেন এক বিরাট বাহিনী। তারপর অবতীর্ণ হলেন ইংরাজদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায়।

সমস্ত বগড়ী এবং পার্শ্ববর্তী বিষ্ণুপুর বিদ্রোহীদের বীরদর্পে থর থর করে কেঁপে উঠলো। দিনের বেলায় নায়েকরা অরণ্যে লুকিয়ে থাকতো এবং রাত্রিতে আরম্ভ করতো লুঠতরাজ। ইংরাজ তৎপর হয়ে উঠলো নায়েকদের দমন করার জন্য। কিন্তু কোন সুবিধা করতে পারলো না। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের আদেশে ওকেলি নামে এক ইংরাজ সেনাপতি এলেন বিদ্রোহ দমনে।

অচলসিংহ এবং তাঁর দল বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। গেরিলা যুদ্ধের নীতি অবলম্বন করে ওকেলির সেনাবাহিনীকে নাজেহাল করে ছাড়লেন। বিদ্রোহীরা কখন কোনদিক থেকে যে আক্রমণ করবে, কিছুতেই নির্ণয় করতে পারল না ওকেলি। এই রীতিতে হঠাৎ কাছাকাছি লড়াইয়ে তীর, ধনুক তরবারীর কাছে ইংরাজদের কামান-বন্দুক একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল।

ওকেলি সাহেব তখন অন্য পথ ধরলো। প্রবৃত্ত হল বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটির সন্ধানে। অবশেষে বুঝতে পারল, বগড়ীর গনগনির ডাঙাই হচ্ছে অচলসিংহের শক্তি সমারোহের প্রাণকেন্দ্র। সম্মুখযুদ্ধে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পাল্লা কষে টিকে থাকা যায় না ভেবে একদিন রাত্রিতে গনগনির ডাঙার চারদিকে সজ্জিত করলো সারি সারি কামান। তারপর সেনাপতির নির্দেশে বর্ষিত হল গোলার পর গোলা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো অরণ্য। তবুও গোলাবর্ষণের বিরাম হল না— সকাল পর্যন্ত চললো একনাগাড়ে।

সূর্যের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল অগ্নিদগ্ধ বিধ্বস্ত বন। এখানে সেখানে পড়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ। যারা আহত

হয়ে পড়েছিল তাদের গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হল। ইংরাজ সেনাপতি নিষ্ঠুর প্রেত হাসিতে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিল ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করার ফল! অথচ সুসভ্য সংজ্ঞায় অভিহিত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সেই সেনাপতি সম্মুখ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে এই হীন পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এই ঘটনার প্রায় একশ' বছর পরে, ১৯১৯ সালের ১২ই এপ্রিল আর একটিবার মাত্র অনুরূপ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগে, দ্বিতীয় ওকেলি—জেনারেল ডায়ার ছিল সেই হত্যাকাণ্ডের নাটের গুরু।

এত করেও সেদিন অচলসিংহকে ধরতে পারেনি ওকেলি। কেমন করে আগুন-ব্যূহ এড়িয়ে তিনি চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন সে কথা কেউ বলতে পারে না। তাঁর এই অন্তর্ধান চিরকালই রহস্যাবৃত থেকে যাবে।

অনেক পরে সচকিতে জানতে পারলো সরকার বগড়ীর পশ্চিম প্রান্তে এক অরণ্যে অচলসিংহ পুনরায় ঘাঁটি স্থাপন করেছেন। যে ভুল অচলসিংহ পূর্বে করেছিলেন, সে ভুল তিনি আর করলেন না। রীতিমত মরিয়া হয়ে উঠলেন এবার। পুনরায় গঠন করলেন বিদ্রোহী বাহিনী। বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ তিনি করবেনই। ক্ষিপ্ত অচলসিংহ হানলেন এবার তীব্র আঘাত। সেই আঘাতে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে কলিঙ্গ হল সচকিত। ইংরাজ সেনা আর কর্মচারীরা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

এদিকে ইংরাজরা মহারাষ্ট্রীয়দের কবল থেকে উড়িষ্যা ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত যোদ্ধারা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিল। অচলসিংহ তাদের আহ্বান জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে তারাও এসে যোগ দিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে। যেখানে দেখতে পেল সাদা চামড়া—নির্দ্বিধায় তাদের হত্যা করে বৃক্ষ শাখায় ঝুলিয়ে দিল। প্রকাশ্য দিবালোকে আক্রমণ চালাতে লাগল ইংরাজ সৈন্যদের উপর।

ধনীদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে দূরদর্শী অচলসিংহ বাড়াতে লাগলেন অস্ত্রবল ও সৈন্যবল। এবার আর কোন ইংরাজ সেনাপতি ক্ষিপ্ত সিংহের মোকাবিলায় ধারে কাছে ভিড়তে পারলো না। ইংরাজদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল, ছুটে পালিয়ে যেতে থাকল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ওকেলীর হীন চক্রান্তে গনগনির অরণ্য ঘিরে যে সব নরনারী ও শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল তারই প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন অচলসিংহ।

এবার বৃটিশ সরকার বুঝতে পারলো, অচলসিংহকে গ্রেপ্তার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এবং তিনি জীবিত থাকলে বিদ্রোহের কোন দিন অবসান হবে না। তখন প্রলোভনের ছলনায় বিভেদনীতির যে চক্রান্তে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, সেই নীতিই ইংরাজ অবলম্বন করলো। ডেকে পাঠালো গদিচ্যুত রাজা ছত্রসিংহকে। রাজার সম্মান দিয়ে ছত্রসিংহকে জানালো, সে যদি অচলসিংহকে ধরিয়ে দিতে পারে তাহলে তার জমিদারীতো ফিরিয়ে দেওয়া হবেই অধিকন্তু আরও একটি জমিদারী প্রদান করা হবে।

একটিমাত্র মাথার বিনিময়ে ছত্রসিংহ এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে সম্মত হল না। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিক্রী করে দিল ইংরাজদের কূট কৌশলের কাছে। তারপর একদিন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে অর্পণ করলো বীর নায়ক অচলসিংহকে।

অচলসিংহ টের পাননি ষড়যন্ত্রের কথা। তাই তিনি সরল বিশ্বাসে ছত্রসিংহের আহ্বানে বসে কথা বলছিলেন। এমন সময় বৃটিশ সেনাপতি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় ও তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অচলসিংহ বুঝতে পারলেন সব কিছু। মৃদু হেসে ছত্রসিংহকে বললেন--লোভে আজ যে হীন কাজ করলে তার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই তোমাকে ভোগ করতে হবে। তুমি জানো না ইংরাজ চরিত্র! যে আশায় এমন কুকাজ করলে, সে আশা তোমার ব্যর্থ হয়ে যাবেই।

বীর অচলসিংহকে জনসমক্ষে গুলি করে হত্যা করা হল। আর ছত্রসিংহ ?

ইংরাজরা বিশ্বাস করলো না তাকে। জমিদারীও পেল না সে সারা জীবন ধরে কেবল অনুশোচনাই করতে হল।

অচল সিংহের পর নায়েকরা কিছুকাল অবশ্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছিল। কিন্তু সে পরাক্রম আর তাদের ছিল না। বৃটিশ সৈন্যরা কালক্রমে তাদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দেয়। একে একে ধরা পড়ে অগ্রগামী বিদ্রোহী। সেই সব বিদ্রোহীদের যেখানে সেখানে ফাঁসি দিয়ে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে দুঃসহ নিষ্পেষণের চাপে স্তব্ধ হয়ে যায় বগড়ীর নায়েক বিদ্রোহ

—:—

ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহের নায়ক জানকু পাথর ও দোবরাজ পাথর

(১৮৩৫)

গারোরা ভারতের আদি বাসিন্দা নয়। "মঙ্গোলয়েড" নামে মূল মানবগোষ্ঠীর একটি শাখা ঐ গারোরা। ওদের আদি বাসস্থান ছিল তিব্বতে। সেই কোন স্মরণাতীত কালে তাদের একটি দল তিব্বত থেকে এসেছিল ভারতে। তারপর কোচবিহার অঞ্চলেই তারা স্থায়ী-ভাবে বসবাস আরম্ভ করে।

কোচবিহারের মানুষ কিন্তু গারোদের সহ্য করতে পারেনি, ফলে বিতাড়িত হয় গারোরা। তখন উপায় না পেয়ে তারা আসামের যোগীপাড়া অঞ্চলে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও আশ্রয় পেল না। তখন বাধ্য হয়ে তারা বসবাস আরম্ভ করে আসামের গৌহাটি এলাকাতে। এখান থেকেও তারা একদিন বিতাড়িত হল। অবশেষে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরভাগে জনবিরল পার্বত্য অঞ্চলে তারা তাদের ঘর বাঁধল।

তারপর কেটে গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী। আর তাদের উপর বিশেষ কোন অত্যাচার হয়নি। পাহাড়ের কোলে তারা ধান ও তুলা উৎপাদন করত এবং সমতলভূমির বাজারে তারা ধান ও তুলার বিনিময়ে কিনে নিয়ে যেত তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। বহু ঝড়ঝাপটা বয়ে গেলেও কিছুটা সুখে ছিল তারা। কিন্তু সে সুখ সইল না তাদের কপালে।

মুঘল আমলেই এক শ্রেণীর জমিদারের উদ্ভব হয়েছিল। তারা সম্রাটকে কর দিত আর জমিদারি শাসন করতো গারোরা হিসাব

ভালভাবে জানত না। সামান্য তেল নুন ইত্যাদির বিনিময়ে জমিদারদের নায়েব গোমস্তারা তাদের কাছ থেকে লুটেপুটে নিত প্রচুর ধান ও তুলা। তারপর চালাতো ব্যবসা এবং প্রচুর লাভ করতো। গারোদের যেই দুঃখ সেই দুঃখই থেকে গেল। পরে বুঝতে পেরে জমিদার এবং নায়েব গোমস্তাদের উপর গারোরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। তখন মাঝে মাঝে সমতল ভূমিতে এসে আরম্ভ করল চুরি ডাকাতি। জমিদাররা নীরবে বসে রইল না। তারা সচেষ্ট হল চুরি-ডাকাতি ঠেকাতে, অত্যাচারও চলল গারোদের উপর। তখনই গারোরা অত্যাচার রোধ করতে গঠন করল দল কিন্তু সুবিধা হল না কিছুই

অষ্টাদশ শতাব্দী। তাদের মধ্যে এক ফকিরের আবির্ভাব হল। তাঁর নাম করম শা। তিনি ছিলেন বাউল। গারোদের মধ্যে এক ধর্মমত প্রচার করলেন। গারোরা তাঁর উপদেশ শুনে মুগ্ধ হল এবং একে একে সবাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। করম শা বুঝালেন, মানুষ সবাই এক। সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত হওয়া উচিত। আর উচিত সত্যনিষ্ঠ হওয়া।

নতুন ধর্মোপদেশ লাভ করে গারোদের মধ্যে এল পরিবর্তন। তারা সংঘবদ্ধ হল এবং এতকাল যে জমিদার গোষ্ঠী তাদের উপর শোষণ চালাচ্ছিল তার প্রতিকার করার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথমে ছাপাতি নামে গারোদের এক সর্দার জমিদারদের কবল থেকে নিজেদের জাতিকে রক্ষা করার জন্য স্বাধীন গারো রাজ্য স্থাপনে হলেন প্রয়াসী। গারোরাও উৎসাহ বোধ করল এবং তাদের সঙ্গে যোগদান করল এ অঞ্চলের হাজং, কোচ প্রভৃতি পার্বত্য অধিবাসীরা।

বাংলায় তখন ইংরাজ শাসন কায়েম হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী ও জমিদারদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে পূর্বের তুলনায় দশগুণ। জমিদাররা দেখল একরোখা ঐ গারোরা যদি ছাপাতির কথা মেনে নেয় তাহলে

মহা অসুবিধার সৃষ্টি করবে। তারা তাই গারোদের বুঝালো, এ ছাপাতি রাজা হয়ে তাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। অতএব সাবধান।

সরল বিশ্বাসী গারোরা জমিদারদের আমলাদের প্রচারকে সত্য বলে ধরে নিল এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ছাপাতির উপর। বাধ্য হয়ে তখন ছাপাতিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হল। ব্যর্থ হল ছাপাতির স্বপ্ন। তবু সহজে হার মানলেন না তিনি। ১৮০২ সালে কালেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব দিলেন, যদি গারোদের এলাকাকে জমিদারদের কবলমুক্ত করা হয় তাহলে তিনি সেই এলাকা থেকে রাজস্ব আদায় করে সরকারের তহবিলে জমা দেবেন। কালেক্টর সাহেব ছাপাতির প্রস্তাব সমর্থন করলেও কার্যকরী করতে পারলেন না।

আপাততঃ ছাপাতির প্রচেষ্টা সার্থক না হলেও কিছু কিছু গারো তাঁর উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানালো এবং জাগরণও সুরু হল সেই থেকে। তারপর গত হল বছর দশেক। গারোদের ধর্মনেতা করম শা করলেন দেহরক্ষা। করম শার শিষ্য টিপু গারোর নেতৃত্বে এল এবার বড় রকমের ধর্মীয় আন্দোলন। টিপুও ছিলেন বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি প্রচার করলেন, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট। অতএব উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকতে পারে না।

এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তখন গারোদের উপর জমিদারদের উৎপীড়ন তুঙ্গে উঠেছে। করভারও বেড়ে চতুর্গুণে ঠেকেছে। অধিকন্তু ১৮১৪ সালে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ইংরাজরা আরও চাপাল কর। গারোদের অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। তখন উপায় না পেয়ে তারা তাদের ধর্মগুরু টিপুর নেতৃত্বে আরম্ভ করল আন্দোলন। যখন কোন অনুরোধ উপরোধে ফল পাওয়া গেল না তখন টিপুই ঘটালেন সশস্ত্র বিপ্লব। প্রথমে জমিদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করলেন। জমিদারদের নায়েব-গোমস্তারা জোর করে খাজনা আদায় করতে চেষ্টা করাতে গড়দরপা নামে একটি জায়গায় টিপুর দলের সঙ্গে হল সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষে পরাজিত হল জমিদারদের পাইক বরকন্দাজরা। টিপুর

দলের সাহস বেড়ে গেল। তারা এবার আক্রমণ করল জমিদারদের কাছারি, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন জমিদাররা। এবং শরণাপন্ন হলেন কালীগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

টিপুকে শাস্তিদানের জন্য প্রস্তুত হল থানার দারোগা পুলিশ। এখানে ওখানে হল খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু পুলিশবাহিনী কোথাও টিপুর দলকে পরাজিত করতে পারল না। টিপু তখন স্থাপন করলেন স্বাধীন গারো রাজ্য। রাজস্ব প্রদান হল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। নিযুক্ত হল বিচারক, ফৌজদার প্রভৃতি। অপরদিকে শহরগুলি থেকে ইংরাজদের বিতাড়িত করে ইংরাজ শাসন ব্যবস্থাকেও বিদ্রোহীরা অচল করে দিল।

শঙ্কিত হয়ে উঠলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। রংপুর থেকে আনালেন এক বড় সৈন্যদল। ১৮২৬ সালের শেষভাগে টিপুর দলের সঙ্গে হল ভয়ানক এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এবার যুদ্ধে পরাজিত হল টিপুর বাহিনী। কিন্তু টিপু ধরা পড়লেন না। পরের বছর তাঁকে করা হল বন্দী। জেলা শাসকের আদালতে হল বিচার। সেই বিচারে টিপুর হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৮৫২ সালের মে মাসে কারাগারেই তিনি দেহরক্ষা করলেন।

টিপুর কারাবাস নতুন ভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো গারোদের মনে। প্রথম বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর তারা দ্বিতীয় বারের জন্য প্রস্তুত হল। ১৮৩৩ সালে বিদ্রোহীদের একত্রিত করলেন জানকু পাথর এবং দোবরাজ পাথর নামে দুজন অসম সাহসিক গারো সর্দার।

কয়েক মাসের মধ্যেই কেঁপে উঠল ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চল। শত শত বিদ্রোহী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়াল দুই নায়কের পাশে। তখন দুই নায়ক বিদ্রোহীদের দু'ভাগে ভাগ করে প্রবল ইংরাজ শক্তির সম্মুখীন হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। দোবরাজ ঘাঁটি স্থাপন করলেন নালিতাবাড়ীতে এবং জানকু সেরপুর নামক শহরের পশ্চিমে কড়ৈবাড়িতে।

এপ্রিল মাস। জানকু ও দোবরাজ দুজন দুদিক থেকে এসে একদিন অতর্কিতে ঘিরে ফেললেন সেরপুর শহরকে। কয়েকটি জমিদার বাড়ী লুণ্ঠন করার পর তারা হানা দিলেন সেরপুরের পুলিস থানার উপর। জমিদাররা যে যেখানে পারলেন আত্মগোপন করলেন, আর পুলিসেরা বাধা দিতে এসে শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। জানকু এবং দোবরাজের দল আক্রোশে জ্বালিয়ে দিল থানাকে এবং সেরপুরে স্থাপন করল তাদের আধিপত্য।

খবরটা বায়ুবেগে ছুটে গেল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দরবারে। পুনরায় গারোরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে দেখে চিন্তিত হলেন জেলা শাসক। কালক্ষেপ না করে চেয়ে পাঠালেন জমিদারদের সাহায্য এবং গেরেট সাহেবের নেতৃত্বে পাঠালেন একটা বড় ফৌজ।

বিদ্রোহীদের হাত থেকে সেরপুরকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য গেরেট সাহেব জমিদারদের বরকন্দাজ এবং নিজের দলকে নিয়ে আক্রমণ চালালেন সেরপুরের উপর। কিন্তু বিদ্রোহীদের কাছে টিকতে পারলেন না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল গেরেট সাহেবের বাহিনী। কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন গেরেট।

গেরেট কিন্তু সহজে হাল ছাড়লেন না। কয়েকদিনের মধ্যে জমিদারদের বরকন্দাজ বাহিনী এবং অতিরিক্ত ফৌজ এনে আক্রমণ করলেন দোবরাজের ঘাঁটি নালিতাবাড়ির উপর। চতুর দোবরাজ অল্পক্ষণ যুদ্ধ করে পরাজয়ের ভান করলেন। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল বিদ্রোহীরা। তারপর ছুটে পালালো পাহাড়ের দিকে। এক রকম বিনা যুদ্ধে নালিতাবাড়ি অধিকার করায় সম্মিলিত ইংরাজ ও জমিদারদের বাহিনী আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। জমিদাররা কাছারিতে প্রবেশ করে মত্ত হয়ে উঠলেন বিজয়োৎসবে। কিন্তু রাত্রিকালে দোবরাজ তাঁর দলবলকে নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সিপাহী ও বরকন্দাজদের উপর। হাতেই থেকে গেল ওদের হাতিয়ার।

কোন সুযোগ পেল না ব্যবহার করতে। প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। দোবরাজ তাঁর সাধের নালিতাবাড়িকে করলেন পুনরুদ্ধার।

অগত্যা গেরেট সাহেবকে পালিয়ে আসতে হল। তিনি বুঝতে পারলেন, বিদ্রোহীদের সংখ্যা কয়েক সহস্রের মত। সামান্য ফৌজ কিংবা জমিদারদের বরকন্দাজের দল কিছুই করতে পারবে না। তখন বাধ্য হয়ে জামালপুরের ইংরাজ সেনানিবাসের অধ্যক্ষ মেজর মনটিথের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

এক জরুরী বার্তায় জেলা শাসক ডানবার সাহেব জানালেন—সেরপুর ও গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী ভূভাগের গারোগণ স্বাধীন গারো রাজ্য স্থাপনের জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। একেবারে অচল করে দিয়েছে এখানকার শাসনব্যবস্থা। সংখ্যায় তারা পাঁচ হাজারেরও বেশি হবে। তীর-ধনুক, বল্লম ও তরবারি হাতে তারা বন্দুকের সঙ্গেও লড়ে চলেছে। ওদের নেতাদের নাম জানকু পাথর ও দোবরাজ পাথর নামে দু'জন সর্দার।

জামালপুরে সজ্জিত হল বেশ বড় রকমের একটা সৈন্যদল। গারোদের দুই নেতাকে সমুচিত শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে দু'জন ইংরাজ সেনানায়ক ক্যাপ্টেন সিল এবং লেফটেন্যান্ট ইয়ং হ্যাজব্যাণ্ড প্রত্যেকে এক একটি দল নিয়ে এগিয়ে গেলেন কড়ৈবাড়ী ও নালিতা-বাড়ীর দিকে।

জানকুর ঘাঁটিকে আক্রমণ করার ভার নিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন সিল। কিন্তু গোপনে সংবাদ পেলেন, তাঁর সম্মুখীন হওয়ার জন্য জানকু প্রস্তুত হয়েছেন প্রায় চার হাজারের মত একটা বিরাট বাহিনীকে নিয়ে।

ভীত হলেন ক্যাপ্টেন সিল। অগত্যা ইয়ং হ্যাজব্যাণ্ডকে ডেকে পাঠালেন উভয়ের দল একত্রিত হয়ে আক্রমণ করার জন্য। ইয়ং

হ্যাজব্যাণ্ড তখন ফিরে এলেন এবং উভয়ে ওরা মে রাত্রিকালে জানকুর ঘাঁটিতে অনতিদূরে ছাউনি ফেললেন। তাঁরা পরদিন ভোরবেলাই চালালেন আক্রমণ। এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না জানকু। বাধ্য হয়ে দলবলকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন পাহাড়ে। তখন ক্যাপ্টেন সিলের সৈন্যদলও ছুটল পাহাড়ের দিকে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেল না একজন বিদ্রোহীকে।

ক্যাপ্টেন সিল মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন এবার। বিদ্রোহীদের খুঁজে বার করবার জন্য সৈন্যদলকে তিন ভাগে ভাগ করে ছড়িয়ে দিলেন এখানে সেখানে। বিদ্রোহীরাও ছিল মহা চতুর। সুবিধা মত পাহাড়ের অভ্যন্তরস্থ গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং ইংরাজ সৈন্যদের নাজেহাল করে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেত।

অবশেষে ৭ই মে ইয়ং হ্যাজব্যাণ্ড আক্রান্ত হয়ে হারালেন বেশ কিছু সৈন্য এবং ৮ই মে ক্যাপ্টেন সিলের ছাউনির উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বহু সৈন্যকে খতম করে দিল বিদ্রোহীরা।

ক্যাপ্টেন সিল এবং লেফটেন্যান্ট ইয়ং হ্যাজব্যাণ্ড দুজনেই হতাশ হয়ে পড়লেন দুর্ধর্ষ পাহাড়ী গারোদের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবেন না ভেবে তাদের ঘাঁটিগুলির সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। কালেভদ্রে দু একজন গারোর সাক্ষাৎ লাভ করলে তাদের ধরে এনে আরম্ভ করতেন নির্যাতন অবশেষে সংবাদ পেলেন, পাহাড়ের অভ্যন্তরেই আছে বিদ্রোহীদের মূল ঘাঁটি। একটি ভাল দুর্গও তৈরী করেছেন তাঁরা। তখনই দুই সেনানায়ক তৎপর হয়ে উঠলেন গোপন ঘাঁটি অনুসন্ধানের কাজে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্গের কোন হদিশই পেলেন না এদিকে বিদ্রোহীরা যখন তখন আক্রমণ অব্যাহত রাখল।

এবার সেনানায়করা রাতের অন্ধকারেই সৈন্যদলকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরাফেরা শুরু করলেন।

কিন্তু বিদ্রোহীদের চোখে ধুলো দিতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন রাতে বিদ্রোহীরা একটি ছোট দলকে এক রকম নিঃশেষ করে গা ঢাকা দিল অন্ধকারে।

বৃটিশ সেনানায়কদ্বয় এবার রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এরই মধ্যে তাঁরা কয়েকজন বিদ্রোহীকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বন্দীদের উপর এবার আরম্ভ করলেন অকথ্য নির্যাতন। শেষে ওদেরই কাছ থেকে লাভ করলেন দোবরাজ পাথরের ঘাঁটির সন্ধান। একরকম সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘাঁটির উপর। কিন্তু দোবরাজের দেখা পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কয়েকজন পুলিশ এবং জমিদারদের কর্মচারীর। তখন ওদের উদ্ধার করা হল এবং দোবরাজের ঘাঁটিটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হল।

এবার অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন ক্যাপ্টেন সিল। আরম্ভ করলেন ব্যাপক ধরপাকড়। বিদ্রোহী সন্দেহে গারোদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হল। জানকু, দোবরাজ এবং অন্যান্য সর্দারদের ঘর আগেই পুড়েছিল। এবার গারো সর্দারদের জানিয়ে দেওয়া হল তারা যদি আত্মসমর্পণ না করে তাহলে তাঁদের প্রচণ্ড শাস্তি দেওয়া হবে।

অত্যাচার ও নির্যাতন চরমে উঠেছিল। গারোরা এবার শঙ্কিত হয়ে উঠল। তাদের পরিবারবর্গের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার দেখে স্থির থাকতে পারল না। মে মাসের ১০ তারিখে পাঁচজন গারো সর্দার আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু জানকু ও দোবরাজ এলেন না। আত্মসমর্পনকারী সর্দারদের লোভ দেখানো হল এঁদের দুজনের খবর প্রদানের জন্য। সর্দাররা কিছু কিছু তথ্য অবশ্য প্রদান করল। তথাপি চতুর ঐ দুই নেতার নাগাল আদৌ পাওয়া গেল না।

ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করল আরো কিছু গারো সর্দার। দু-দশ

জন সর্দার ধৃতও হল। বহু সর্দার ও বিদ্রোহী ধরা পড়ে যাওয়ায় এবং আত্মসমর্পণ করায় দোবরাজ ও জানকু বিপদে পড়ে গেলেন। সম্ভব হল না বিদ্রোহীদের জড় করা। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা পালিয়ে গেলেন। তারপরে আর ওই দুই বীর বিদ্রোহীর খবর পাওয়া যায়নি, আর তাঁদের নেতৃত্বে গারো বিদ্রোহের এইখানেই ঘটে পরিসমাপ্তি।

জানকু ও দোবরাজ যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছিলেন তাঁকে প্রচণ্ড ইংরাজ শাসনও সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত করতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং কখনও কখনও দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। মোট কথা ১৮৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল গারোদের বিদ্রোহ। তারপর থেকে ময়মনসিংহে আর কোন বিদ্রোহ হয়নি

বারাসতের ওয়াহাবি বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীর এবং তাঁর বাঁশের কেল্লা

(১৭৭২-১৮৩১)

বাংলার বুকে তিতুমীরের প্রথম আবির্ভাব একজন ধর্মসংস্কারক হিসাবে। কিন্তু রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে হয়েছিল।

তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিশার আলি। ১৭৭২ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে এক কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী। বয়স একটু বাড়লে তিনি এক কুস্তিগীরের আখড়ায় লাঠি ও তরবারি চালনা, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি শিক্ষালাভ করেন এবং উত্তরকালে একজন ভাল যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

সেকালে জমিদারদের মধ্যে বড একটা সম্প্রীতি ছিল না। পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা বাঁধতো। তাছাড়া চুরি ডাকাতি তো ছিলই। এইসব কারণে জমিদাররা পাইক বরকন্দাজদের রাখতেন। তিতুমীর চাকুরীর উদ্দেশ্যে নদীয়ার জমিদারের কাছে যান। জমিদার তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা দেখে নিযুক্ত করেন একটি ছোট বরকন্দাজ বাহিনীর সর্দার রূপে।

কিছুদিন পরে উক্ত জমিদারটির পার্শ্ববর্তী আর এক জমিদারের সঙ্গে কলহ উপস্থিত হল। কলহ শেষ পর্যন্ত রূপ নিল দাঙ্গায়। তখন শাস্তিদানের ভার পড়লো তিতুমীরের উপরে। তিতু দাঙ্গায় জয়লাভ করলেন বটে কিন্তু পরাজিত জমিদার তিতুর নামে আদালতে

মিথ্যা নালিশ করলো। প্রমাণিত হল, তিতু ইচ্ছা করেই দাঙ্গা বাধিয়েছিলেন। জমিদারের কোন দোষ নেই। অতএব বিচারে তাঁর হল কারাদণ্ড।

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিতুর জীবনে এল আমূল পরিবর্তন। চাকুরীর প্রতিও এল তাঁর দারুণ বিতৃষ্ণা। সর্দারের চাকরী ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন ঘরে বসে কাটালেন। তারপর তীর্থধর্মের উদ্দেশ্যে সোজা পাড়ি দিলেন মক্কায়।

সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কিছু কিছু কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল। সেইসব কুসংস্কারকে দূরীভূত করার জন্য আরবে আবদুল ওয়াহাব এক আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ নামে জনৈক পণ্ডিত মুসলমান মক্কাবাস কালে আবদুল ওয়াহাবের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারগুলিকে দূরীভূত করতে বদ্ধপরিকর হন।

তিতু যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন সেই সময় তাঁর সঙ্গে হল সৈয়দ আহম্মদের সাক্ষাৎ। তিতুকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হলেন সৈয়দ আহম্মদ এবং সেইখানেই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেন ওয়াহাবি আদর্শে। তিতুও খুশি হয়ে গ্রহণ করলেন উক্ত ধর্মমত এবং বাংলায় ওয়াহাবি মত প্রচার করার জন্য উৎসাহ বোধ করলেন।

সৈয়দ আহম্মদ এবং তিতুমীর কিছুকাল পরে দুজনেই ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। সৈয়দ আহম্মদ প্রচার সুরু করলেন উত্তর ভারতে এবং তিতুমির বাংলায়। কিন্তু উত্তর ভারত থেকে যেমন সাড়া পাওয়া গেল, বাংলায় তেমন পাওয়া গেল না।

অথচ বাংলার মুসলমানদের মধ্যেই কুসংস্কার দানা বেঁধে উঠেছিল বেশি পরিমাণে। তার কারণ, এখানকার বেশির ভাগ মুসলমান এককালে ছিলেন নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু। সামাজিক উৎপীড়ন থেকে সে আমলে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন উদার ইসলাম

ধর্মকে। কিন্তু পুরাতন সংস্কার ও রীতিনীতিকে তাঁরা আদৌ পরিত্যাগ করতে পারলেন না। নতুন ধর্মের অনুশাসন তাঁদের কাছে হল অবহেলিত। আঁকড়ে থাকলেন পূর্বের আচার আচরণকে। তাই খাঁটি ইসলাম ধর্মমত অনুযায়ী সেগুলি গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিতু তাঁদের সেই গোঁড়ামিকে পরিত্যাগ করে ওয়াহাবের ধর্মমতকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু বিশেষ সাড়া না পাওয়ায় ডেকে পাঠালেন তাঁর গুরু সৈয়দ আহম্মদকে।

সৈয়দ আহম্মদের নাম বাংলার মুসলমানদের কানে অনেক আগেই এসেছিল। তাঁর আগমন সংবাদ লাভ করে দলে দলে মুসলমান উপস্থিত হলেন কলিকাতায়। সেখানে এক বিরাট সভায় আহম্মদ ব্যাখ্যা করে শোনালেন ইসলামের অনুশাসন এবং ওয়াহাবি ধর্মমত। মুগ্ধ হলেন মুসলমানগণ এবং তিতুমীরকেও স্বীকার করে নিলেন ধর্মীয় আন্দোলনের নেতা হিসাবে। তিতুর জনপ্রিয়তা এবার বেড়ে উঠলো।

তিতু হঠাৎ ধর্মীয় নেতা হয়ে ওঠায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন মোল্লা-মৌলবীরা। অপরদিকে ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ মেনে নিলেন না তিতুকে। পদে পদে তারা আরম্ভ করলেন বিরুদ্ধাচরণ। ধনীদের আচরণে নিতান্তই ক্ষুব্ধ হলেন তিতুমীর। এদিকে ইংরাজেরা তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে সন্দেহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলো।

তিতুমীরকে বাধ্য হয়ে ধনী জমিদার এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রচারে নামতে হল। জনসাধারণকে অবহিত করালেন ইংরাজ এবং ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষক জমিদারদের কুকীর্তির কথা। ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি এবং অত্যাচারের জন্য জনসাধারণও আগে থেকে ওদের উপরে ছিল রুষ্ট। তদুপরি বাংলার মুসলমান নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরাজরা অন্যায়ভাবে উৎখাত করে গদি নিয়েছে বলে তাদের প্রতি কোন মুসলমানের মনোভাব ভাল ছিল না। তিতুর প্রচারে তারা মুগ্ধ হল এবং দলে দলে ওয়াহাবি মতে দীক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ

করলো। এবার সত্যই শঙ্কিত হয়ে উঠলো বাংলার নীলকর ও জমিদারগোষ্ঠী। এতদিন পর্যন্ত তিতুমীর সশস্ত্র বিপ্লবের কথা আদৌ চিন্তা করেননি। কিন্তু তাঁর জন্মস্থান বাদুরিয়ার নিকটবর্তী পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের আচরণে তিনি বিদ্রোহী না হয়ে পারলেন না। কৃষ্ণদেব রায় ওয়াহাবিদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না। যখন তাঁর মুসলমান প্রজাগণ দলে দলে ওয়াহাবি ধর্মমতে দীক্ষিত হয়ে দাড়ি রাখতে আরম্ভ করলো তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে দাড়ির উপর খাজনা নির্ধারণ করলেন। ঘোষণা করলেন, যারা দাড়ি রাখবে তাদের বাৎসরিক আড়াই টাকা করে খাজনা দিতে হবে।

জমিদারের নায়েব গোমস্তারা এবার নতুন কর আদায় করতে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। জোর জবরদস্তিও হল। মুসলমানরা ব্যথিত হল আর তিতুমীর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সবাইকে জানিয়ে দিলেন, দাড়ির খাজনা যেন কেউ না দেয় এবং কাছারিতে ডাক পড়লেও যেন কেউ না যায় সেখানে।

তিতুমীর জানতেন, জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করার ফল কী হবে। তাই তিনি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং অল্পদিনেই বিক্ষুব্ধ মুসলমান যুবকদের নিয়ে গড়ে ফেললেন একটা বাহিনী।

এদিকে কৃষ্ণদেব রায়ের দেখাদেখি পার্শ্ববর্তী সমস্ত জমিদার চালু করলেন দাড়ির খাজনা। দীক্ষিতদের কেউ খাজনা দিলেন, কেউবা সময় চেয়ে নিলেন। কিন্তু বাদুরিয়ার পার্শ্ববর্তী সর্পরাজপুরে কৃষ্ণদেব রায়ের গোমস্তারা দাড়ির খাজনা আদায় করতে এলে তিতুমীরের নির্দেশে মুসলমানরা জানিয়ে দিলেন, দাড়ি রাখা তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসনের একটি অঙ্গ এবং এই হীন চক্রান্ত তাঁরা মেনে নেবেন না।

কৃষ্ণদেব রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। জানিয়ে দিলেন—দশ দিনের মধ্যে দাড়ির খাজনা কাছারিতে জমা দিয়ে যেতে হবে। তা না হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে সর্পরাজপুরের মুসলমান প্রজাদের। কিন্তু

কৃষ্ণদেব রায়ের আদেশ কেউ পালন করলেন না। ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো জমিদারের। একদল লাঠিয়াল পাঠিয়ে ধ্বংস করে দিলেন সর্পরাজপুরের মসজিদ এবং জ্বালিয়ে দিলেন মুসলমান প্রজাদের ঘরবাড়ী।

তিতুমীর বাদুরিয়া থানায় কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন; কিন্তু থানার দারোগা রামরাম চক্রবর্তীও ছিল ওয়াহাবি বিদ্বেষী এবং কৃষ্ণদেব রায়ের বন্ধু। রিপোর্টে বললো, তিতুমীর নিজে মসজিদ ধ্বংস করে কৃষ্ণদেব রায়ের নামে মিথ্যা নালিশ করেছেন। আরও উল্লেখ করলো, সর্পরাজপুরের ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকেই কৃষ্ণদেব রায় কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। অতএব তাঁর পক্ষে নির্দেশ দেওয়া কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

দারোগার রিপোর্ট পেয়ে ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিতু। সেই সঙ্গে জেগে উঠলো প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা। ওয়াহাবি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমদের অনুরোধ জানালেন কিছু কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য। খুশি হয়ে ওয়াহাবিরা খাজনার পরিবর্তে তিতুমীরকেই সাহায্য দান করলে। তিতুমীর সেই অর্থে ক্রয় করলেন যুদ্ধোপকরণ। প্রায় তিনশত মুসলিম যুবককে নিয়ে গঠন করলেন একটি দল। আর ঠিক সেই সময় মিস্কিন শাহ নামে জনৈক ফকির দলবল নিয়ে যোগ দিলেন তিতুমীরের সঙ্গে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত এই সাহায্য তিতুর শক্তিকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিল।

তিতুমীর প্রথম আক্রমণ করলেন পুঁড়ার জমিদার বাড়ী। জমিদার কৃষ্ণদেব রায় বিদ্রোহীদের আসতে দেখে তাড়াতাড়ি সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। তিতুর দলবল ঘিরে ফেললো এবং দরজা ভাঙ্গতে চেষ্টা করলো। ঠিক সেই সময় ছাদ থেকে বর্ষিত হল অজস্র ইট পাটকেল। বাধ্য হয়ে রণে ভঙ্গ দিতে হল তিতুকে। কিন্তু একটা কাজ করে বসলেন তিতু। যেহেতু কৃষ্ণদেব রায় সর্পরাজপুরের মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন সেই কারণে তিতু পুঁড়ার দেবমন্দিরে প্রবেশ করে গোহত্যার দ্বারা মন্দির কলুষিত করলেন। মন্দিরের প্রধান

পুরোহিত বাধা দিতে এলে তাঁকে হত্যা করলো তিতুর দলের লোকেরা। অতঃপর পুঁড়া বাজারের সমস্ত দোকানপাট লুণ্ঠন করে ফিরে এলেন গ্রামে।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে তিতু তাঁর দলের লোকদের কাছে প্রচার করলেন, দেশের প্রকৃত শত্রু ইংরেজরা। ওরা বিদেশ থেকে ব্যবসা করতে এসে হীন ষড়যন্ত্রের দ্বারা দেশকে দখল করেছে। ওদের তাড়িয়ে দিয়ে দেশের শাসনভার কোন মুসলমানের হাতে দিতে হবে। কেননা উত্তরাধিকার স্বত্রে সিংহাসন মুসলমানেরই প্রাপ্য।

আরও কিছুকাল গত হল। তিতুমীর যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করে নিজেকে "বাদশাহ" বলে প্রচার আরম্ভ করলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত ব্যক্তিই তাঁকে অভিষিক্ত করলো। তিতু আরম্ভ করলেন নীলকুঠি এবং জমিদার বাড়ী লুণ্ঠন। তারপর বাদশাহের নির্দেশ হিসাবে প্রজাদের খাজনা দিতে বারণ করলেন এবং চাষীদের নীলচাষ বন্ধ করার হুকুম দিলেন। ওয়াহাবি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা মেনে নিল তিতুর নির্দেশ। আর তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো নীলকর ও জমিদার উভয় গোষ্ঠী।

প্রথমে তিতুমীর এবং তার ওয়াহাবিদের শাস্তি দিতে এগিয়ে এলেন গোবরডাঙ্গার সাহসী জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করার জন্য দলবল নিয়ে এগিয়ে এলেন মোল্লাহাটির নীলকুঠির মালিক ডেভিস সাহেব এবং কালীবাবুর নিকট-আত্মীয় কলিকাতার তৎকালীন বিখ্যাত জমিদার লাটুবাবু। যুদ্ধে সম্মিলিত তিন শক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে লড়াই করলো তিতুর দল। যুদ্ধে ত্রিশক্তির হল শোচনীয় পরাজয়। কোন রকম পালিয়ে ডেভিস সাহেব করলো আত্মরক্ষা। এ ডেভিস সাহেবের অত্যাচারের জন্য বিদ্রোহীরা ভয়ানক-ক্রুদ্ধ ছিল। তারা খুঁজে বেড়াতে লাগলো ডেভিসকে। কিন্তু তার দেখা পেল না। শেষে তার বজরাটাকে ভেঙ্গে ফেলে কিছুটা শান্ত হয়ে ফিরে গেল।

এদিকে ডেভিস সাহেব পালিয়ে গিয়ে গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়ের কাছারিতে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করলো। দেবনাথ সেই ইংরাজ তনয়কে অভয় দিলেন।

কয়েকদিন পরে সেই সংবাদ কানে এলো তিতুমীরের। দেবনাথ রায়ের উপর জারি হল বাদশাহের হুকুমনামা। ডেভিসকে তাঁর দলের হাতে সমর্পণ না করলে দেবনাথকে সমুচিত শিক্ষাদান করবেন।

দেবনাথ রায় ছিলেন শক্তিমান জমিদার। তাঁর ছিল একটা বড় বরকন্দাজ বাহিনী এবং বন্দুকের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। অপরদিকে নিজেও ছিলেন একজন ভাল যোদ্ধা। তাই তাচ্ছিল্য সহকারে উড়িয়ে দিলেন তিতুর আদেশ। অগত্যা গোবরা গোবিন্দপুরের রাজবাড়ী আক্রমণ করতে হল তিতুকে। প্রাণপণ যুদ্ধ করেও দেবনাথ তিতুমীরের দলকে ঠেকাতে পারলেন না। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন তিনি।

পরপর দুটি যুদ্ধে জয়লাভ করে তিতুর সাহস বেড়ে গেল। এবার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত কৃষকদের নীলচাষ বন্ধ করার জন্য এবং জমিদারকে খাজনা না দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। তিতুর শক্তি দেখে সে অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় খুবই খুশি হয়েছিল। কারণ তারা উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারে। তিতুর আদেশ তাদের কর্ণে যেন মধু বর্ষণ করলো এবং জমিদার ও নীলকরদের রক্তচক্ষুকে তারা গ্রাহ্যই করলো না।

তিতুমীরেরও সুরু হল অভিযান। অর্থাৎ নীলকুঠি ও জমিদার বাড়ী লুন্ঠন। ওয়াহাবি-বিরোধী মুসলমান জমিদারও বাদ পড়লেন না সমস্ত জমিদারের কাছে করও দাবী করলেন। যাঁরা কর দানে অসম্মতি প্রকাশ করলেন তাঁদের অবস্থা হল শোচনীয়। বাধ্য হয়ে জমিদাররা স্বীকার করলেন কর দিতে। আর তিতুমীরের জ্বালায় নীলকর সাহেবরা পালিয়ে গেল সে অঞ্চল ছেড়ে। এইভাবে নদীয়া, ফরিদ-

পুর, বারাসত ও চব্বিশ পরগণার এক একটা বিরাট অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হল তিতুর প্রভুত্ব। পুলিশ বাহিনী, জমিদারদের বাহিনী কেউই আর সাহস করলো না তিতুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে।

জমিদার ও নীলকুঠির সাহেবরা বুঝতে পারলো, তিতুকে দমন করার সাধ্য তাদের নেই। অগত্যা তারা নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট এবং বাংলার ছোটলাট উভয়ের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করলো। পুলিশরাও জানালো, তিতুমীরের অত্যাচারে এখানকার শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়েছে। তিতুর দল সমস্ত জমিদার ও নীলকরদের হটিয়ে দিয়েছে এবং জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণ করছে। অবিলম্বে তিতুমীরকে দমন না করলে অদূর ভবিষ্যতে এখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

স্বজাতীয়দের বিপদ শুনে ইংরাজ সরকার আর স্থির থাকতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ এল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। কলিকাতা থেকে এল একদল সিপাহী। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার থানার দারোগা, সিপাহী এবং কলিকাতা থেকে প্রেরিত সিপাহী দলকে নিয়েই অগ্রসর হলেন বিদ্রোহ দমন করতে। তিনি ভেবেছিলেন, তিতুমীরের লাঠিয়াল এবং তীরন্দাজদের সায়েস্তা করতে দু-একশ বন্দুকই যথেষ্ট। বেশি সিপাহীর প্রয়োজন নেই।

তিতুমীরের তখন মূল ঘাঁটি নারিকেলবেড়িয়ায়। আলেকজাণ্ডার নারিকেলবেড়িয়ায় প্রবেশ করা মাত্রই তিতুর ভাগিনেয় এবং সেনাপতি গোলাম মাসুম ঘিরে ফেললেন আলেকজাণ্ডারের বাহিনীকে। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল ইঁট ও পাথরের টুকরার বর্ষণ। সিপাহীদের বন্দুক হাতেই থেকে গেল আর সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। ঘোড়ার পিঠে ছিলেন আলেকজাণ্ডার, বিপদ বুঝে ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিলেন। ভয়ে দিশেহারা হয়ে তীব্র বেগে ছুটলো ঘোড়া। শেষ পর্যন্ত একটা নদীর জলকাদায় তাঁর ঘোড়া এবং তিনি গলা পর্যন্ত পুঁতে গেলেন। জনৈক পথচারী ব্রাহ্মণ সাহেবকে উদ্ধার

করলেন এবং বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা সাহেবের প্রাণ রক্ষা করলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে গেল সেই দারোগা রামরাম বসু। বিদ্রোহীরা তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে পূর্বের প্রতিশোধ গ্রহণ করলো।

আলেকজান্ডারের পরাজয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলো বৃটিশ রাজশক্তি। তিতুও বুঝতে পারলেন, ইংরাজেরা সহজে তাঁকে নিস্তার দেবে না। এবার অবশ্যই খুব বড় ধরণের যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। তাই নারিকেলবেড়িয়ায় নির্মান করলেন একটি বাঁশের কেল্লা। কথিত আছে, আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে হাজার হাজার বাঁশ সংগ্রহ করে কেল্লাটি তৈরি করেছিলেন বলে কেল্লাটির উক্ত নামকরণ হয়েছিল। শক্তি বাড়ানোর জন্য খুব দূরের ইংরাজ কুঠিগুলিও হল লুণ্ঠিত। তাছাড়া জমিদার বাড়ীতো বটেই সেই লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা সংগ্রহ করা হলো খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র। বাহিনীকেও করা হল জোরদার।

ইংরাজ আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলো না, তিতুকে ধ্বংস করার কৌশল উদ্ভাবন করতে যত্নবান হল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের আদেশে নদীয়া, সাতক্ষীরা, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় জমিদাররা জোট বাঁধলেন এবং নদীয়ার কালেক্টর সজ্জিত করলেন একটা বড় বাহিনী। সঙ্গে কয়েকটা হাতীকে আনা হল। সম্মিলিত ইংরাজ এবং জমিদারদের বাহিনী বীর বিক্রমে এগিয়ে চললো নারিকেলবেড়িয়ার দিকে।

তিতুমীর সংবাদটা পূর্বেই লাভ করেছিলেন। তাই বিভিন্ন স্থানে এক এক দল বিদ্রোহীকে লুক্কায়িত অবস্থায় রেখেছিলেন। পথে ছিল একটা পরিত্যক্ত নীলকুঠি। তারই ভেতরে দলবল নিয়ে লুকিয়ে ছিলেন সেনাপতি গোলাম মাসুম। বৃটিশ বাহিনী নিকটবর্তী হতেই তাঁর দল বর্ষণ করতে আরম্ভ করলো ইঁট, পাথরের টুকরা এবং কাঁচা বেল। আচমকা এইভাবে আক্রান্ত হওয়ায় সিপাহী ও বরকন্দাজ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো

আপন প্রাণরক্ষার জন্য। আর ঠিক তখনই গোপন স্থানগুলি থেকে বিদ্রোহীরা বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সিপাহীদের উপর। বহু সিপাহী ও বরকন্দাজ প্রাণ হারালো এবং কালেক্টর সাহেব পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

এই ঘটনার পর ইংরাজরা চিন্তিত হয়ে পড়লো। দেখলো, তিতুকে ধ্বংস করা যত সহজ ভেবেছিল ততখানি নয়। এবার হল বিরাট আয়োজন। একজন সুদক্ষ ইংরাজ সেনানায়কের নেতৃত্বে প্রস্তুত হল একশত দুর্দ্ধর্ষ গোরা সৈন্য, তিনশত দেশী এবং প্রায় এক সহস্র সশস্ত্র কুলি। সঙ্গে নিল কয়েকটা অগ্নিবর্ষী কামান।

ইংরাজ সেনাপতি তাঁর বিশাল বাহিনীকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করতে। রাত্রিকালে পথিমধ্যেই আক্রান্ত হল সেই বাহিনী। এবারও নিক্ষিপ্ত হল ইঁটের টুকরা এবং কাঁচা বেল। ইংরাজ পক্ষের বহু জনে হতাহত হলো এবং অবশিষ্টরা বাধ্য হল সেখান থেকে পালিয়ে যেতে।

তিতুমীর ভাবলেন, বিপদ এবার কেটে গেল। দলবল নিয়ে ফিরে এলেন বাঁশের কেল্লায়। কিন্তু বিটিশ সেনাপতির বুদ্ধির কাছে তাঁকে হার মানতে হলো। রাত্রির মধ্যেই হতাবশিষ্ট সৈন্যদের একজোট করে অতি সন্তর্পনে এগিয়ে গেলেন নারিকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লার দিকে। ভোর হওয়ার আগেই কেল্লার দিকে মুখ করে দুটি কামান স্থাপন করলেন এবং ঘিরে ফেললেন তিতুর সাধের সেই বাঁশের কেল্লাকে।

সেনাপতি প্রথম একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠ করে তিতুকে আত্মসমর্পণ করার আদেশ দিলেন। পরপর তিনবার পাঠ করলেন উচ্চৈঃস্বরে। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না কেল্লার ভেতর থেকে। অগত্যা সেনাপতি আদেশ দিলেন সৈন্যদের বন্দুক চালাতে। মুহূর্ত-মধ্যে গর্জে উঠলো শতশত বন্দুক। কিন্তু ভেদ করতে পারলো না বাঁশের কেল্লা।

এদিকে দুর্গের ভেতর থেকে বিদ্রোহীরা চালালো পাল্টা আক্রমণ। বর্ষিত হতে আরম্ভ করলো অজস্র ইট ও কাঁচা বেল। উপায় না পেয়ে সৈন্যরা পেছু হটতে বাধ্য হল। সেনাপতি এবার আদেশ করলেন কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে দু-দুটি কামান উদ্গীরণ করতে লাগল আগুন। থরথর করে কেঁপে উঠলো বাঁশের-কেল্লা। তারপর একসময় কাৎ হয়ে পড়লো। ফলে চাপা পড়লো বহু বিদ্রোহী। একটি গোলা তিতুর দক্ষিণ উরুদেশ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। লুটিয়ে পড়লেন বীর বিদ্রোহী এবং অল্প পরে তাঁর অমর আত্মা নশ্বর দেহত্যাগ করে যাত্রা করলো অমৃতলোকে।

ধ্বংস হয়ে গেল তিতুর সাধের বাঁশের কেল্লা। বন্দী হলেন গোলাম মাসুম সহ আটশজন বিদ্রোহী। আদালতে আরম্ভ হলো বিচার। বিচারে কারও হল কারাদণ্ড কারও দ্বীপান্তর এবং কারও হল ফাঁসী। মুক্তি পেলেন না একজনও।

আর তিতুর প্রধান সেনাপতি ও ভাগিনের গোলাম মাসুম? জীবন্ত অবস্থায় তিতুকে না পেয়ে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো তাঁরই উপর। বন্দী অবস্থায় তাঁকে আনা হল নারিকেলবেড়িয়ায় ধ্বংস-প্রাপ্ত বাঁশের কেল্লার সম্মুখে। প্রকাশ্য দিবালোকে সহস্র সহস্র দেশবাসীর সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ফাঁসিকাঠে। এই করুণ দৃশ্য দেখতে পারলো না দেশের লোক। শতশত হিন্দু মুসলমানের চোখের জলে বীর শহীদ গোলাম মাসুম যাত্রা করলেন সেই অক্ষয় আনন্দনিকেতন বেহশ্‌তের পথে।

: :—

ফরিদপুরের ফরাজী বিদ্রোহের নায়ক দুদুমিঞা

(১৮৩৮-১৮৪৭)

তিতুমীরের মতই দুদুমিঞার প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল একজন ধর্মসংস্কারক রূপে। মোল্লা মৌলবীদের দুর্নীতি এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের কুসংস্কার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পিতা শরিয়তুল্লার প্রচারিত ধর্মমতকে তিনি জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মমতকে গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় গ্রহণ করতে পারলেন না। প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করায় দুদুমিঞাকে তাঁরা শাস্তি দান করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

দুদুমিঞা যখন তাঁর ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে যাত্রা করেছিলেন, ঠিক সেই সময় নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত নিরীহ কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখে অন্তর কেঁদে উঠে তাঁর। ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করলেন কৃষকদের হয়ে আন্দোলন। দুদুমিঞার ধর্মীয় আন্দোলন শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় রাজনৈতিক আন্দোলনরূপে।

দুদুমিঞা ছিলেন অত্যন্ত উদার, ধর্মভীরু ও নিরহঙ্কারী। তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং অনর্থক রক্তপাতের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। প্রথমে তিনি আনতে চেয়েছিলেন একটা বিপ্লব। যাতে অহিংসার মাধ্যমে কৃষকেরা তাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করতে পারে। কিন্তু সাগরপারের নীলকররা অন্য ধাতুতে গড়া ছিল। কৃষকদের সমস্ত অনুরোধ উপরোধকে উপেক্ষা করে অব্যাহত রাখলো কৃষক নির্যাতন। বাধ্য হয়ে তখন দুদুমিঞাকে ধরতে হল বিদ্রোহের পথ।

নানা সভাসমিতির মাধ্যমে দুদুমিঞা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন—মাটি আল্লার দান। এতে কেবলমাত্র জমিদার ও নীলকরদের অধিকার নেই। মাটির উপর সবার আছে সমান অধিকার। অতএব কোন কর আমরা জমিদারদের প্রদান করবো না এবং নীলকরদের অত্যাচারও মুখ বন্ধ করে সহ্য করবো না।

দুদুমিঞার উক্তি জনসাধারণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। দুঃখের দিনে দলে দলে হিন্দু মুসলমান কৃষক সমবেত হল তাঁর পাশে। এবার তিনি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করলেন এবং বিদ্রোহের ঘাঁটি স্থাপন করলেন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলায়।

দুদুমিঞার পিতা শরিয়তুল্লা ছিলেন এক মুসলমান জোলা। মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি মক্কা যাত্রা করেন। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর কাল শরিয়তুল্লা কাটিয়েছিলেন মক্কায় এবং তিতুমীরের মত ওয়াহাবি আদর্শে দীক্ষিত হন।

শরিয়তুল্লা ছিলেন আরবী ভাষায় মহাপণ্ডিত। কথিত আছে, মক্কা থেকে দেশে ফেরার পথে তিনি একদল ডাকাতের হাতে পড়েন। ডাকাতরা তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। এমনকি তিনি মক্কায় অবস্থান কালে যে "স্মৃতিকথা" লিখেছিলেন সেটিও কেড়ে নিয়ে যায়। অত্যন্ত দুঃখিত হলেন শরিয়তুল্লা। "স্মৃতিকথা"কে উদ্ধার করার জন্য যোগ দিলেন ডাকাতদের দলে। ডাকাতদের সঙ্গে তাঁকে এখানে ওখানে যেতে হত। আর বিশ্রামের সময় তিনি তাদের গল্প বলে শোনাতেন। বলাবাহুল্য, সেইসব গল্পের মাধ্যমে তিনি ডাকাতদের নীতি শিক্ষা দান করতেন এবং তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করতেন।

ধীরে ধীরে ডাকাতদের মধ্যে এল পরিবর্তন। এই হীন কাজ থেকে তারা বিরত হয়ে গ্রহণ করলো শরিয়তুল্লার ধর্মমত। তবে ওয়াহাবি মতাবলম্বী হলেও তাঁর মতবাদ ছিল অন্য ধরণের। ডাকাতরা ডাকাতি পরিত্যাগ করে শরিয়তের সঙ্গে ফিরে এল ফরিদপুরে এবং

আত্মোৎসর্গ করলো নতুন ধর্মপ্রচারে। এই ধর্মই পরবর্তীকালে "ফরাজী মতবাদ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ফরাজী শব্দের অর্থ আল্লার আদেশ যা ফরিদপুরে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু শরিয়তুল্লা নির্বিঘ্নে তাঁর ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। মোল্লা মৌলবীদের দ্বারা এখানে ওখানে হলেন উৎপীড়িত। অথচ তাঁর ধর্মমত ছিল অত্যন্ত সহজ ও উদার। তাঁর উপদেশাবলী এমন সুন্দর ছিল যে সাধারণ মানুষ শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত এবং তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করতো। ফলে রক্ষণশীল ধনী মুসলমানরা তাঁর উপর হয়ে উঠলেন ক্রুদ্ধ। অপরদিকে তিনিও কৃষকদের প্রতি নীলকরদের এবং জমিদারদের অত্যাচার বরদাস্ত করতে পারেননি। বাধ্য হয়ে ওদের বিরুদ্ধে একসময় তাঁকে প্রচারে নামতে হয়েছিল। ফলে তিনি ঐ ধনী মুসলমানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিলেন ঢাকা থেকে। তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল, তিনি প্রচার করেছিলেন: "সমস্ত মানুষই আল্লার সন্তান। উচ্চ-নীচ এবং প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক আল্লার নির্দেশ নয়"। কিন্তু ধনীরা মনে করতেন, আল্লার নির্দেশে পৃথিবীতে তারা শাসন করতেই এসেছেন। আল্লার দ্বারা অবহেলিতরাই জন্মগ্রহণ করে নীচকুলে এবং দরিদ্র রূপে। ধনীদের আদেশপালন করার জন্যই দরিদ্রের জন্ম। শরিয়তুল্লা তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক শরিয়তুল্লা বেশিদিন ধর্মপ্রচার করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদুমিঞা পিতার ধর্মমতকে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পিতার মত সহস্র লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করেও শেষ পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন তাঁর সংগ্রাম। সেই সংগ্রামই বাংলার ইতিহাসে "ফরাজী বিদ্রোহ" নামে স্থান লাভ করেছে।

দুদুমিঞার প্রকৃত নাম মহম্মদ মহসীন (প্রসিদ্ধ দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীন নন)। ১৮১৯ সালে তিনি ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন

এবং পিতার মত তরুণ বয়সে মক্কায় গমন করেন। মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পিতার ধর্মমতকে প্রচার করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচার দমন করার জন্য বিপ্লবের আহ্বান জানান ১৮৩৭ সালে। অনেক আগে থেকেই ফরিদপুরের কৃষক সম্প্রদায় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একরকম ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল। এবার যোগ্য নেতা লাভ করে তারা বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ করলো। রাজস্ব ছাড়া জমিদাররা বাড়ীর পুজো. বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে যে সব কর অন্যায়ভাবে গ্রহণ করতো এবার সেগুলি প্রদান করতে প্রজারা করলো অস্বীকার, আর নীলকরদের ইচ্ছানুযায়ী ধানী জমিতে নীলচাষও বন্ধ করলো।

জমিদার ও নীলকরদের রোষদৃষ্টিতে পড়লেন এবার দুদুমিঞা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দুদুমিঞা প্রথমে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চাননি। তিনি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ববঙ্গের কতিপয় অঞ্চলে তাঁর সমর্থকদের কয়েকজনকে “খলিফা” নিযুক্ত করেছিলেন। খলিফাদের কাজ ছিল ফরাজীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং নীলকর ও জমিদারদের উৎপীড়ন বন্ধ করা। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষকদের কাছ থেকে খলিফারা কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করতেন এবং কোথাও অত্যাচার হচ্ছে দেখলে আদালতে মামলা দায়ের করতেন। উক্ত কারণে জমিদার ও নীলকর সম্প্রদায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। তারা প্রস্তুত হলো দুদুমিঞাকে শাস্তিদানের জন্য।

দুদুমিঞাও বুঝেছিলেন বিদ্রোহের ভবিষ্যৎ কোথায়। তাই তিনিও গোপনে গোপনে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি ভালভাবেই বুঝতে পারলেন, নীতি বাক্যের দ্বারা ওরা ভুলবে না এবং আদালতে মামলা দায়ের করলেও যে কোন উপায়ে জাল কেটে বেরিয়ে যাবে। খালি হাতেও জমিদারদের বরকন্দাজবাহিনীর সামনে দাঁড়ানো যাবে না।

ফরিদপুর অঞ্চলের জমিদাররা দুদুমিঞাকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে

সমবেত হলেন। তাদের সঙ্গে যোগদান করলেন রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায় এবং নীলকর গোষ্ঠী। বিভিন্ন অঞ্চলে দলে দলে লাঠিয়াল পাঠিয়ে যে সব কৃষক কর দানে অসম্মতি প্রকাশ করেছিল এবং নীলচাষ পরিত্যাগ করেছিল তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিতে আরম্ভ করলো। কৃষকদেরও আটক করে রাখলো এবং তাদের উপর চলতে লাগলো অমানুষিক নির্যাতন। এতদিনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো তুতুমিঞার। তিনিও জমিদারদের দমন করার জন্ম পাঠালেন দলে দলে লাঠিয়াল। তারা উদ্ধার করে আনলো কৃষকদের এবং হটিয়ে দিল বরকন্দাজদের। এর পরই বিদ্রোহীরা আরম্ভ করলো নাশকতামূলক কাজ। সেটি ছিল ইংরাজী ১৮৩৮ সাল।

তুতুমিঞার লাঠিয়ালদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জমিদার ও নীল-কুঠির মালিকেরা সরকারের শরণাপন্ন হলে সরকার তার হিতকারীদের ক্ষতির কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। অবিলম্বে প্রেরণ করলো একটি পুলিস বাহিনী এবং ঘোষণা করলো, সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ দমন করা ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

সম্মিলিত পুলিস, জমিদার ও নীলকরদের দ্বারা প্রেরিত বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হল তুতুমিঞাকে। কিন্তু ভয় পেলেন না একটুও। পূর্ববৎ চালিয়ে গেলেন সংগ্রাম। তাঁর এবং কৃষকদের মনোবলের কাছে পরাজিত হল সম্মিলিত পুলিস বাহিনী। উভয় পক্ষের বহু লোক হল হতাহত।

জমিদার এবং নীলকররা এবার আবেদন জানালো, তুতুমিঞাকে দমন করার জন্ম অবিলম্বে কোম্পানীর সিপাহীদের প্রেরণ করা হোক। কিন্তু সরকার চিন্তা করলো, একমাত্র তুতুমিঞাকে গ্রেপ্তার করলেই বিদ্রোহ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। লোকটির আবার কোন দুর্গ নেই, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান, অস্ত্রশস্ত্রেও সজ্জিত থাকেন না। অতএব তাকে গ্রেপ্তার করতে অসুবিধাই বা কোথায় ?

সত্যই অসুবিধা হল না সরকারের। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলকুঠি

লুণ্ঠনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। কারাগারে তাঁকে আটকে রাখা হল এবং আদালতে আরম্ভ হল বিচার। কিন্তু সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রমাণ করতে পারল না। প্রমাণ করবেই বা কোত্থেকে! কোন চাষী এগিয়ে এল না তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করতে। আর জমিদার কিংবা নীলকররা কোন দিনই দেখেনি লোকটিকে অস্ত্র ধরতে। অতএব বাধ্য হয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে হল।

কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দুদুমিঞা আবার ধরলেন নিজ মূর্তি। পুনরায় অত্যাচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এবং প্রেরণ করতে আরম্ভ করলেন তাঁর লাঠিয়ালদের। ১৮৪৪ সালে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। এবারও আনা হল লুণ্ঠনের অভিযোগ। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণাদির অভাবে এবারও তাঁকে মুক্তিদান করলো আদালত।

দ্বিতীয়বার কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করার পর দুদুমিঞা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করলেন। এবার বন্ধ করতে বললেন জমিদারদের খাজনা। নীলকরদের বিরুদ্ধেও গ্রহণ করলেন যথোচিত ব্যবস্থা। কৃষকদের বলে দিলেন, তারা যেন কিছুতেই নীলচাষ না করে। যদি কোন নীলকর নীলচাষ করতে বাধ্য করায় তাহলে কৃষকেরা যেন জমি ছেড়ে চলে আসে এবং খাস জায়গাগুলিতে বসবাস আরম্ভ করে।

সে সময় মহাজনরা চড়া সুদে কৃষকদের টাকা ধার দিত। জমিদারদের কর প্রদান ও অন্যান্য প্রয়োজনে চাষীদের টাকা ধার করতে বাধ্য হতে হত। কিন্তু মহাজনরা তাদের উপর এমন সুদ চাপাতো যে, জীবনে কাউকে আর ঋণ শোধ করতে হত না। দুদুমিঞা ঘোষণা করলেন, সুদ দেওয়া ও নেওয়া দুইই ধর্মবিরোধী। অতএব সুদ কাউকে দেওয়া চলবে না। চাষীরা খুশি হয়ে মহাজনদের ধারে কাছে গেল না।

তুতুমিঞা পূর্বে খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। এবার গঠন করলেন জনতার আদালত। গ্রামের মানুষের ন্যায়-অন্যায় বিচার করার জন্য কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তির উপর ভার দিলেন। তাঁরা গ্রামের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতেন। তাছাড়াও তুতুমিঞা কতকগুলি গুপ্তচরও নিযুক্ত করলেন। গুপ্তচররা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত এবং কোথাও কোন দরিদ্রের উপর নির্যাতন হচ্ছে জানতে পারলে তুতুমিঞাকে খবর দিত।

এইভাবে একটা বিরাট অঞ্চল তুতুমিঞার স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। জমিদার ও মহাজনদের কারবার বন্ধ হল এবং নীলকররা রাগে জ্বলতে লাগল। তুতুমিঞাকে বাধা দিতেও অগ্রসর হল অনেকে। কিন্তু তুতুমিঞার দল তাদের সহজে নিস্তার দিল না। এখানে ওখানে নীলকুঠি হল লুন্ঠিত এবং জমিদার বাড়ি হল আক্রান্ত। ১৮৪৭সালে তুতুমিঞা পরিচালিত বিদ্রোহ একেবারে তীব্র আকার ধারণ করল। পাঁচচর নামক স্থানে নীলকুঠির ম্যানেজার ডানলপ সাহেবের কুঠিগুলি একেবারে ভস্মীভূত করে দিল বিদ্রোহীরা। তারপর জমিদার গোপীমোহন এবং তাঁর আমলাদের উপরও আক্রমণ চালালো।

সরকার এবার উপায় না পেয়ে বিদ্রোহ দমনের অভিপ্রায়ে সামরিক বাহিনীকে নিয়োগ করলো। এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সুরু হলো ধরপাকড়। বিনা কারণে গ্রেপ্তার করা হল কৃষকদের। কোথাও কোথাও তাদের উপর দৈহিক নির্যাতনও চললো। সামরিক আইন জারি করার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য সরকার তুতুমিঞাকে আটক করেছিল বিদ্রোহ শান্ত হলে তুতুমিঞার হল বিচার। আদালতে বিচারকদের সম্মুখে তুতুমিঞা তীব্র ভাষায় নিন্দা করলেন নীলকরদের। তিনি বললেন—"আমি আমার নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলবো না। নীলকররা যেভাবে কৃষকদের যথাসর্বস্ব লুন্ঠন করে নিচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের হত্যা করছে, তাতে কৃষকরা উপায় না পেয়েই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।"

আদালতে দাঁড়িয়ে সরকারকেও তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন তিনি। তিনি বারবার উল্লেখ করলেন : নীলকরদের এবং জমিদারদের রক্ষা করতে সরকার বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু যারা সহস্র সহস্র মানুষকে নির্যাতন করছে এবং তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে তাদের বিচার হচ্ছে না। দুদুমিঞার অভিযোগগুলি অস্বীকার করলো আদালত। বিচারে তিনি এবং তাঁর বাষট্টিজন সহকর্মী অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। প্রত্যেকের হল বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড। কিন্তু দুদুমিঞা সহজে মেনে নিলেন না আদালতের নির্দেশ। আপীল করলেন উচ্চ আদালতে। পুনর্বার হল বিচার। সেখানেও তিনি নিন্দা করলেন নীলকরদের ও জমিদারদের কাজের। উচ্চ আদালত কিন্তু মুক্তিদান করলো দুদুমিঞা এবং তাঁর সহকর্মীদের।

১৮৫৭ সাল। ভারতের বুকে জ্বলে উঠলো মহাবিদ্রোহের আগুন। দুদুমিঞার মত এতবড় বিপ্লবীকে সরকার বাইরে রাখতে ভয় পেল। কোন সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ না করেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল তাঁকে রাজবন্দী হিসাবে আটক রেখে। এই তাঁর চতুর্থ ও শেষ কারাবরণ। কারাগারে থাকতে থাকতেই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে তাঁকে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বার বার কারাবরণের ফলে তাঁর দেহে ভর করেছিল নানা রকমের ব্যাধি। ১৮৬০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর এই মহাবিপ্লবীর জীবনাবসান হল। তাঁর নশ্বর দেহকে কবরস্থ করা হয়েছিল জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামে আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরভূমিতে। কিন্তু সে কবর আজ আর নেই। যেন নিজেকে পবিত্র করার জন্য আড়িয়াল খাঁ কবরকে গ্রাস করে অস্থিগুলি নিজ বুকে গ্রহণ করেছে।

দুদুমিঞা আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর মতবাদ এখনও পূর্ববঙ্গের অনেকেই অনুসরণ করেন। তাঁকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিদু এবং তাঁর ভ্রাতাগণ

(১৮৫৫-১৮৫৬)

সেই কোন আদিকাল থেকে আদিবাসী সাঁওতালরা অরণ্যে অরণ্যে বসতি স্থাপন করেছিল। বাঘ ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অরণ্যের রুক্ষ মাটিকে কর্ষণ করে তারা কালাতিপাত করে আসছিল পুরুষানুক্রমে। প্রকৃতির আপন হাতে গড়া উদার, নিরহঙ্কারী ও সাদাসিধে এই সাঁওতালরা ভয় কাকে বলে জানে না। সুসভ্য নাগরিকের সংস্পর্শেও তারা বড় একটা আসতে চায় না। সেকালে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তারা নিজেরাই উৎপন্ন করতো। মুদ্রার ধার ধারতো না। কেবলমাত্র বিনিময় প্রথার মাধ্যমেই নিজেদের চাহিদা পূরণ করতো। তাদের প্রয়োজনও ছিল নিতান্ত সামান্যই।

অনেকের মতে সাঁওতালরা বহিরাগত। সুদূর অতীতে ওরা এবং ওদের সমগোত্রীয়রা ভারতে প্রবেশ করে এবং বিহার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে ওরাই প্রথম ভারতে জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজের পত্তন করেছিল। তারপর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে সহস্র সহস্র বছর। ওদের কতজনকে বাঘে খেয়েছে, কতজন কুমীরের পেটে গেছে, কতজনকে সাপে কেটেছে। বিনা চিকিৎসায়ও মারা গেছে কতজনে। তবু ওরা অরণ্য পরিত্যাগ করেনি। অরণ্য ওরা ভালবাসে। তারপর ?

কালের কুটিল ধারায় ভারতবর্ষে বিদেশী বণিকদের হল আগমন। বাণিজ্য করতে এল ইংরাজরাও। অবশেষে "পোহালে শর্বরী বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"। তখনই সূচিত হল ভারতবর্ষের

ইতিহাসে এক নতুন পর্ব। অর্থগৃধ্নু ইংরাজ বণিকেরা চাইল শুধু অর্থ রোজগার করতে। তাদের সঙ্গে যোগ দিল সুযোগ সন্ধানী এদেশের কিছু মানুষ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশীয় জমিদারদের বিলি করলো জমি। রাজস্বও বাড়িয়ে দিল অকল্পনীয়-ভাবে। খাস জমি, অরণ্য, প্রান্তর সব কিছুকে বিলি করে চাইল রাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে। যে সাঁওতালরা এতদিন সঙ্গোপণে অরণ্যের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে বাস করছিল, যারা রাজস্ব কাকে বলে জানতো না, জমিদার কাকে বলে জানতো না, ব্যবসায়ী-মহাজনদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, তারাও ইংরাজদের রাজস্বের আওতায় পড়লো। তাদের কাছেও জমিদারের নায়েব গোমস্তা এল রাজস্ব আদায় করতে।

বিহারের ভাগলপুর অঞ্চল "দামিন ই কো" ছিল সাঁওতাল প্রধান অঞ্চল (দামিন-ই-কোর পরবর্তী কালের নাম সাঁওতাল পরগণা)। ইংরাজদের কাছ থেকে জঙ্গল ইজারা নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য জমিদারদের প্রয়োজন হল সাঁওতালদের। অত্যন্ত সরল—প্রতারণা ও ধূর্ততার সঙ্গে যাদের কোনদিন পরিচয় ছিল না, সেই সব সাঁওতাল বাবুদের কথায় বিশ্বাস করে জন্মভূমি ছাড়লো। তাছাড়া সাঁওতালদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাও তাদের সহস্র সহস্র পুরুষের বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য করিয়েছিল। প্রথমে তারা বসবাস স্থাপন করে বাংলার বীরভূম জেলায়। তারপর সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ে বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে। কিছু কিছু সাঁওতাল আবার ছড়িয়ে পড়ে বিহারের পাকুর, দুমকা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। এইসব জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিদারদের নির্দেশে তারা বসতি স্থাপন করলো ১৮০০ সালের দিকে। জমিদাররা রাজস্বও পেল এবং প্রয়োজন মত কুলিও লাভ করলো।

কর্মঠ সাঁওতালরা অরণ্যের এতকালের বন্ধ্যা মৃত্তিকায় সোনা ফলালো। ঘরে ঘরে বাজলো মাদল, ঘরে ঘরে নৃত্যগীত। তাদের

সেই সঙ্গীতের সুর বহু দূরে উঠতি একদল ব্যবসায়ীর কানে এসে আঘাত করলো। সেখানকার সোনালী ফসলের আঘ্রাণও এসে লাগলো তাদের নাকে। ছুটলো পূবের বাংলা থেকে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী, পশ্চিমের সাহাবাদ, ছাপরা, বেত্তিয়া, আরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ভোজপুরী ও ভাটিয়ারা। অর্থের সঙ্গে সাঁওতালদের তখন পরিচয় হয়নি। ব্যবসায়ীরা লবণ, তামাক, কাপড় প্রভৃতির বিনিময়ে জলের দামে ধান, সরিষা প্রভৃতি কিনে নিয়ে চালান দিল ভারতের বিভিন্ন শহরে।

কিছুকাল পরে ব্যবসায়ীরা আরম্ভ করলো দাদন দিতে। হিসাব সাঁওতালরা বুঝতো না। ফলে যা খুশি তাই আরম্ভ করলো ব্যবসায়ীরা। অবশেষে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত আমদানি হল মহাজনদের। টাকা ধার দিত। কিন্তু এমন হিসাব করতো যে সর্বস্ব বিক্রি করেও সাঁওতালরা মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করতে পারতো না।

অপরদিকে জমিদাররাও চালালো অবাধ শোষণ। জমিদারদের ঘরে যত গেল, তার থেকে বেশি গেল নায়েব, গোমস্তাদের ঘরে। পুলিশেরা ও সরকারি আমলারা রইল নিষ্ক্রিয়। আর উৎপীড়িত হল দরিদ্র সাঁওতালরা। তাদের গরু বাছুরকে বেঁধে নিয়ে গেল, তাদের শস্যক্ষেত্রকে নষ্ট করলো, তাদের ছেলে মেয়েদের ধরে এনে ক্রীতদাস বানানো হল, তাদের পাঁঠা-মুরগী প্রভৃতি জোর করে কেড়ে নিল, এমনকি তাদের মেয়েদের সম্মানও কেউ রাখলো না। ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে গেল। না সরকার, না জমিদার—কেউ এল না তাদের রক্ষা করতে। শেষে আত্মরক্ষার জন্য একরকম মরিয়া হয়েই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। সমর্থন করলো বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সহস্র সহস্র উৎপীড়িত শ্রমজীবীরা।

সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ১৮৫৪ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো। তাদের প্রতিহিংসা জেগে উঠলো মনে। যেহেতু

ব্যবসায়ী, মহাজন ও জমিদাররা তাদের সব কিছু লুটেপুটে নিচ্ছে যাচ্ছে, প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করছে, অতএব তারা বদলা নেবে। এই উদ্দেশ্যে বীরসিং মাঝি নামে সাঁওতালদের বাছাই করা একদল এক সর্দার অসম সাহসী যুবকদের নিয়ে গঠন করলেন এক ডাকাত দল। তারা বুক ফুলিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো. মহাজনদের কাজের প্রতিবাদ জানালো দু-এক জায়গায় ডাকাতিও করলো। মহাজনরা তাদের সন্দেহ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেখানকার থানার দারোগা মহেশ দত্তকে জানাল। দারোগা প্রথমে কর্ণপাত করলো না মহাজনদের কথায়। অগত্যা ওরা পাকুরের জমিদারের কাছে বর্ণনা করলো দুর্বিনীত সাঁওতালদের কীর্তি কাহিনী। জমিদার তখন মহাজন এবং নায়েব গোমস্তাদের সঙ্গে যুক্তি করে বীরসিং মাঝিকে ধরে আনলো। তারপর ঐ সাঁওতালদের সামনেই তাঁর উপর আরম্ভ করলো অত্যাচার।

সেদিন জমিদারের বরকন্দাজদের সামনে সাঁওতালরা কিছু বললো না। কেবল রাগে ফুলতে ফুলতে চলে গেল বীরসিংকে নিয়ে। প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা এত প্রবল হয়ে উঠলো যে, দু এক দিনের মধ্যেই রাত্রিকালে আরম্ভ করলো মহাজনদের বাড়ী লুণ্ঠন। তখন ব্যবসায়ী-মহাজনরা শরণ নিল জমিদার এবং থানার দারোগার। মহেশ দত্ত এবার বেরিয়ে পড়লো সাঁওতাল ডাকাতদের গ্রেপ্তার করতে।

গোকো নামে এক ধনী সাঁওতাল বাস করতেন। তিনি ছিলেন ডাকাতদের সমর্থক। অপরদিকে গোকোকে মহাজনরা কোন প্রকারে ফাঁদে ফেলতে না পারায় আগে থেকেই ছিল ক্রুদ্ধ। মহাজনদের কথায় মহেশ দত্ত ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করলো গোকোকে। তাঁকেও করা হল অপমানিত ও লাঞ্ছিত। শেষে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিতে হল গোকোকে।

এবার যেন বিস্ফোরণ ঘটলো সাঁওতালদের মধ্যে। পল্লীতে পল্লীতে

মাদলের তালে তালে ঘোষিত হল বিদ্রোহের বার্তা। ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ থেকে সহস্র সহস্র সাঁওতাল এসে মিলিত হল দামিন-ই-কো অঞ্চলে। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো, বীরসিং মাঝি এবং গোক্কোকে যেভাবে নির্যাতন করেছে তার বদলা তারা নেবেই।

এদিকে মহেশ দারোগা সুরু করলো ধরপাকড়। পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করে বিনা অভিযোগে গ্রেপ্তার আরম্ভ করলো। তার উপর চালালো দৈহিক নির্যাতন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন। আর সেই আগুনের ভেতর থেকে জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করে বেরিয়ে এলেন সেদিনের সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক সিদু।

সিদুরা ছিলেন চার ভাই। দামিন-ই-কোর সদর পরগণার বারহাইত শহর থেকে অল্প দূরে ভাগনাদিহি গ্রামের এক দরিদ্র সাঁওতালের ঘরে তাঁদের জন্ম হয়েছিল। নাম তাঁদের সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। জ্যেষ্ঠ সিদু এবং মধ্যম কানু সাঁওতালদের ঐক্যবদ্ধ করার কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁরা জানতেন, একমাত্র ঈশ্বরের দোহাই ছাড়া ওদের কিছুতেই সংঘবদ্ধ করা যাবে না। সরল বিশ্বাসী ওরা। কোন ধারণা ওদের মনে একবার গেঁথে দিতে পারলে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারবে না। তাই সিদু ও কানু নিজেদের উঠানে ভগবানের মূর্তি গড়িয়ে আরম্ভ করলেন পূজা। আর পল্লীতে পল্লীতে ঘোষণা করে দিলেন, সিদু ও কানু ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন। প্রতি রাত্রিতে ঈশ্বর সাঁওতালী পোষাক পরিধান করে আবির্ভূত হন সিদু ও কানুর সম্মুখে এবং তাঁর নির্দেশ কতকগুলি সাদা কাগজের টুকরায় লিখে সিদুর মাথার উপর রেখে যান।

সিদু ও কানু ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রচার করার জন্য তাঁদেরই উঠানে প্রতিষ্ঠিত দেবতার সম্মুখে ডেকে পাঠালেন সাঁওতালদের। স্বয়ং ঈশ্বর এসেছেন সিদুর ঘরে, দেখার জন্য কাতারে কাতারে ছুটে এল সাঁওতাল।

প্রায় দশ সহস্র নির্যাতিত মানুষের সামনে সিধু ও কানু ভাষণ রাখলেন। জানালেন: সাঁওতালদের প্রতি ধনী মহাজন, জমিদার ও পুলিশের অত্যাচার ঈশ্বরের আসনকে টলিয়ে দিয়েছে। তাই ছুটে এসেছেন ঈশ্বর। বলে গেছেন, যারা তোমাদের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে, তোমাদের ছেলেদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে, যারা তোমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নিচ্ছে তাদের তোমরা ক্ষমা করো না। জেগে ওঠো তোমরা, আমি আছি তোমাদের পাশে।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো দশ সহস্রের সেই বিরাট জনতা। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম নিবেদন করে প্রতিজ্ঞা করলো, প্রতিকার আমরা চাই—জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করবো আমাদের জাতিকে।

সভায় সিধু ঘোষণা করলেন, ব্যবসায়ী মহাজনদের তাড়িয়ে দিয়ে আমরা স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য গঠন করবো। কামার, কুমোর, মুচি, মেথর, মোমিন সম্প্রদায়ের মুসলমান, আর দরিদ্র কৃষক—যারা আমাদেরই মত অহর্নিশ নির্যাতন ভোগ করে চলেছে তাদের আমরা কিছু বলবো না। আমাদের লক্ষ্য ঐ "দিকু"রাই (ধনী মহাজন)।

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সাঁওতাল দলবদ্ধ হয়ে রওনা হল কলিকাতা অভিমুখে। কয়েকদিন পরে সাঁওতালরা যে খাদ্য সঙ্গে করে এনেছিল, তা শেষ হয়ে উঠতেই কতকগুলো দল খাদ্য সংগ্রহের জন্য লুণ্ঠন করতে মনস্থ করলো। পাঁচকেতিয়ার বাজারে এসে পড়তেই নেতাদের আদেশের অপেক্ষা না রেখে পাঁচজন ধনী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর দোকান ঘেরাও করলো। ঐ পাঁচজন ব্যবসায়ীর প্রতি সাঁওতালদের ছিল প্রচণ্ড আক্রোশ। ওদের জিনিসপত্র কেবল লুঠ করলো না, পাঁচজনকেই ওরা হত্যা করলো নির্মমভাবে।

অপরাপর মহাজন ভীত হয়ে প্রচুর অর্থ মহেশ দারোগার পায়ের

কাছে ঢেলে দিয়ে একরকম সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে আনলো দারোগা এবং তার পুলিশ বাহিনীকে।

মহেশ দারোগা সাঁওতালদের নিরীহ রূপটাই দেখতে অভ্যস্ত ছিল। ঘটনাস্থলে এসে দেখলো, পুলিশের ভয়ে অধিকাংশ সাঁওতাল গা ঢাকা দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ অনুচরদের আদেশ দিল সিদ্ধু ও কানুকে গ্রেপ্তার করার জন্য। সিদ্ধু ও কানু সঙ্গে সঙ্গে বুক ফুলিয়ে এসে দাঁড়ালেন দারোগার সামনে। বললেন—"আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে গ্রেপ্তার কর।"

কোন বিবেচনা না করেই মহেশ দত্ত সিদ্ধু ও কানুকে বেঁধে ফেলার হুকুম দিল। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘিরে ফেললো সহস্র সহস্র সাঁওতাল। মহেশ দত্তকে ধরে সিদ্ধুর হাতে সমর্পন করলো। তাদের অনুচরদের এবার হত্যা করলো নিষ্ঠুরভাবে। আর কুখ্যাত সেই মহেশ দারোগা, যে হাজার হাজার সাঁওতালকে লাঞ্ছিত করেছিল তার বিচার হল সেইখানেই। সিদ্ধু নিজ-হাতে কেটে ফেললেন দারোগার মাথা।

কলিকাতা যাওয়া হল না। দারোগা হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব ঘোষণা করলেন "হুল (বিদ্রোহ) আরম্ভ হয়ে গেছে। চারদিকে শালগাছের ডাল পাঠিয়ে দাও। দিকুদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের রাজ্য নিজেরা দখল কর।"

রুদ্রমূর্তিতে আবির্ভূত হল সাঁওতাল। আরম্ভ হল থানার দারোগা আর মহাজনদের উপর অত্যাচার। মহেশ দত্তের পর নিহত হল প্রতাপ নারায়ণ এবং খান সাহেব নামে আরও দুজন অত্যাচারী দারোগা। বার-হাইতের অধিকাংশ মহাজন প্রাণ হারালো। বাদবাকিরা প্রাণের ভয়ে ধন সম্পদ ছেড়ে কোন প্রকারে পালিয়ে গেল। নায়েব, গোমস্তা, পুলিশ, জমাদার, এমনকি চৌকিদাররাও সাঁওতালদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেল না। হাজার হাজার সাঁওতাল তীর, ধনুক, বল্লম, কুঠার ইত্যাদি নিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে

সারা দামিন-ই-কো অঞ্চল চষে ফেললো—একটি মহাজন, একটি পুলিশ রইল না। সিধু ঘোষণা করলেন, কোম্পানীর রাজত্ব আর নেই। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য।

আকস্মিক এই সংবাদে স্তব্ধ হয়ে গেল ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী। নিরীহ সাঁওতালরা যে কোনদিন বিদ্রোহ করতে পারে, এমন ধারণা তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভাগলপুরের কমিশনার সাহেব প্রথমে তাই আমল দেননি বিদ্রোহের কথায়। তারপর চারদিক থেকে যখন ভয়ানক সংবাদগুলো আসতে আরম্ভ করলো, তখন তিনি বিস্ময়ে কথাই বলতে পারলেন না। আরও সংবাদ পেলেন, বিদ্রোহী সাঁওতালরা রাজমহলের পথ ধরে এগিয়ে আসছে ভাগলপুরের দিকে। তখন তিনি সেনাপতি বারোজকে পাঠালেন বিদ্রোহ দমন করতে। অপরদিকে বারোজকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানালেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও জমিদারদের এবং প্রতি থানার দারোগাদের।

বারোজ এগিয়ে এলেন বিদ্রোহ দমনে। কিন্তু রাজমহলে পৌঁছেই ভয়ে কেঁপে উঠলেন তিনি। জলস্রোতের মত ছুটে আসছে সহস্রের পর সহস্র উন্মত্ত সাঁওতাল। পেছু হটতে বাধ্য হলেন বারোজ, কমিশনারকে জানিয়ে দিলেন, দশ সহস্রের কম সাঁওতাল কোথাও একত্রিত হয় না। তাঁদের দমন করার সাধ্য আমাদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীর মোটেই নেই।

অগত্যা কমিশনার সাহেব দিনাপুরের সেনাবাস থেকে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ হাজার সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ দান করলেন। তারপর ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, সিংভূম ও মুঙ্গের জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের জানালেন সাধ্যানুযায়ী সৈন্য এবং কিছু সংখ্যক হস্তী প্রেরণ করার জন্য।

সহস্র সহস্র শিক্ষিত সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সেনাপতি বারোজ গেলেন বিদ্রোহ দমনে। ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুলাই ভাগলপুর জেলার পীর পাঁইতির ময়দানে উভয় পক্ষে হল তুমুল যুদ্ধ। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে বারোজের হল শোচনীয় পরাজয়। বহু ইংরাজ

সৈন্য ও দেশী অফিসার হল নিহত। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হল বারোজকে।

পীরপাঁইতির যুদ্ধে জয়লাভের পর সাঁওতালরা ভাগলপুর সদর, কলগঙ্গ ও রাজমহলকে ইংরাজ শাসন মুক্ত করে ছাড়লো। তারপর ধীরে ধীরে বিদ্রোহীদের কবলে এল বিহারের পাকুর ও গোদ্দা অঞ্চল। অপরদিকে বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে জমিদার, নীলকর ও ধনী ব্যবসায়ীদের বিতাড়িত করলো।

ব্রিটিশ সিংহাসন এবার টলমল করে উঠলো। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি আদেশ দিলেন সাঁওতালদের এলাকায় সামরিক আইন জারি করার জন্য। সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের মাথার দাম নির্ধারিত হল দশ হাজার করে টাকা এবং ছোট ছোট নায়কদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার টাকা।

কিন্তু পুরস্কার ঘোষণাই সার হলো। একজনও কেউ ধরা পড়লেন না তাঁদের মধ্যে। তখন গভর্ণর জেনারেল ডালহৌসি করলেন বিদ্রোহ দমনের বিরাট আয়োজন। পূর্ব ভারতে যেখানে ছিল যত সৈন্য সবাইকে প্রেরণ করা হল দামিন-ই-কো অঞ্চলে। ছুটে এল কামান বাহিনী, হস্তী বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর পাঠালেন প্রচুর রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র। আর পাঠালেন পঞ্চাশটি হস্তী। জমিদার ও নীলকররা সাহায্য করলো সৈন্য ও অর্থ দিয়ে। এবারও বাহিনী পরিচালনা করলেন সেনাপতি বারোজ।

মেঘ গর্জনের মত সুরু হল কামানের গর্জন। তারপর শত শত হস্তীর সদম্ভ পদক্ষেপ। কেঁপে উঠলো সাঁওতাল পল্লী। বিদ্রোহীরা তীর ধনুকের দ্বারা ব্রিটিশ বাহিনীর কামানকে স্তব্ধ করতে পারবে না ভেবে দলে দলে গ্রাম ছেড়ে পালালো। এদিকে সেনাপতি বারোজ ও মেজর সাকবার্গ আরম্ভ করলেন নারী ও শিশুর উপর উৎপীড়ন। পল্লীর পর পল্লী জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে। প্রাণ হারাতে লাগলো শিশু ও

মহিলারা। তথাপি ভগ্নোৎসাহ হল না বিদ্রোহীরা। সুযোগ বুঝে যখন তখন আক্রমণ করে তাদের নাজেহাল করতে লাগলো।

কামানের গোলার সম্মুখে এবং হস্তীর পদতলে পিষ্ট হল গ্রামের পর গ্রাম। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল সহস্র সহস্র সাঁওতাল কুটির। বিদ্রোহীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল বার-হাইত। বাঁকুড়া ও বীরভূমকে করা হল বিদ্রোহীদের কবলমুক্ত। তথাপি একটি বিদ্রোহীকেও ধরা গেল না। অব্যাহত রইল তাদের আক্রমণ। সরকার তখন ঘোষণা করলো, সাঁওতালদের প্রতি তারা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল —বর্তমানে তাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কতকগুলি দুষ্ট লোকের চক্রান্তে তারা আজ ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। তাই যদি তারা সেই সব চক্রান্তকারী নেতাদের সরকারের হাতে সমর্পণ করে তাহলে মার্জনা করবে সাঁওতালদের।

পরম ঘৃণাভরে সাঁওতালরা প্রত্যাখ্যান করলো সরকারের আদেশ। ব্যাপকভাবে ধরপাকড়, পল্লীর পর পল্লী ধ্বংস এবং শিশু ও নারীকে হত্যার ফলে যে বিদ্রোহটা স্তিমিত হয়েছিল, তা সরকারি ঘোষণার ফলে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। মাত্র সাত সপ্তাহ পরে পুনরায় সুরু হল বিদ্রোহীদের তৎপরতা। গ্রামের ধনীদের গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে তারা গায়ের জ্বালা মেটাতে আরম্ভ করলো, ডাক চলাচল বন্ধ করে দিল। প্রায় বার চৌদ্দ হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহীর বীরদর্পে আবার কেঁপে উঠলো এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

সেপ্টেম্বর মাসে মাটি কেটে গড় তৈরি সহস্র সহস্র সাঁওতাল সাড়ম্বরে করলো অকালবোধন। জগন্মাতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে সংহার মূর্তি ধারণ করলো। সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম, থানা, জমিদারবাড়ী, নীলকুঠি, কোন কিছুই লুণ্ঠন করতে বাদ দিল না। আবার ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করলো বিদ্রোহের আগুন।

ব্রিটিশ সরকার দেখলো, অরণ্যের আদিম এই বাসিন্দাদের অস্ত্র

দিয়ে ঠেকাতে পারবে না। এরা মরবে, তবু আত্মসমর্পন করবে না। যাদের জন্য তাদের বিদ্রোহ, বা যে কারণে তারা আজ মারমুখী হয়ে উঠেছে, সরকার তার জন্য আদৌ চিন্তা করলো না। সামরিক আইনের নামে আরম্ভ করলো গণহত্যা। সহস্র সহস্র সৈন্য দিয়ে ঘিরে ফেলা হল অরণ্য এবং সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা। পঞ্চাশটা হাতীকে উন্মত্ত করে ছেড়ে দেওয়া হল। তাদের পায়ের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু বরণ করতে লাগলো শত শত বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও শিশু। যেখানে দেখতে পেল সাঁওতালের কুটির, সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ে দিল আগুন। তবুও আত্মসমর্পণ করলো না বিদ্রোহীরা। শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও লড়াই করে গেল। বন্দুকের গুলি বুক পেতে গ্রহণ করলো তবু মাথা নত করল না।

কোন কোন সেনাপতি উল্লেখ করেছেন, "বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলে আমরা আত্মসমর্পণ করতে বলতাম। পরিবর্তে হাতের তীর ছুঁড়তো। পাল্টা গুলি চালাতাম আমরা। তাদের প্রাণহীন দেহগুলো লুটিয়ে পড়তো মাটিতে; তবু দু-একজন যারা বেঁচে থাকতো তারাও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতো কিন্তু প্রাণের ভয়ে ধরা দিতে আসতো না।"

একজন সেনাপতি বলেছিলেন—"একবার আমরা একটি বিদ্রোহীর দলকে ঘিরে ফেলে আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়েছিলাম। বিদ্রোহীরা অবহেলা ভরে সেই সুযোগ প্রত্যাখান করায় গুলি চালাতে বাধ্য হতে হয়। কয়েকজন লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালানো বন্ধ করে পুনরায় দেওয়া হল সে সুযোগ। তার জবাবে তারা নিক্ষেপ করলো তীর। আবার চললো গুলি, আবার দেওয়া হল সুযোগ। কিন্তু প্রতিবারেই জবাব এল তীরের ফলায়। শেষে বেঁচে ছিল একজন মাত্র বৃদ্ধ সাঁওতাল। রক্তাক্ত তার দেহ - কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো টাঙ্গি হাতে। একজন সিপাহী কাছে গিয়ে বললো, অস্ত্র ফেলে দাও। তৎক্ষণাৎ অর্ধমৃত বৃদ্ধের হাতের টাঙ্গি ছেদন করলো সিপাহীর মস্তক।"

ব্যাপক সেই হত্যার ফলে দামিন-ই-কোর বনভূমি রক্তে লাল হয়ে গেল। প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার সাঁওতাল প্রাণ হারালো। ভয়লেশহীন বীর সাঁওতালদের নিশ্চিহ্ন করে তবেই সরকার আয়ত্তে আনলো বাংলা ও বিহারের এক বিস্তীর্ণ এলাকাকে।

এদিকে ব্যাপক হত্যা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল হতাবশিষ্ট সাঁওতালগণ। সিহু তখনও চালিয়ে যাচ্ছিলেন যুদ্ধ। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একদল হতাশ সাঁওতাল ব্রিটিশ শিবিরে জানিয়ে এল সিহুর গোপন আশ্রয়স্থল। তৎক্ষণাৎ একদল সশস্ত্র পুলিশ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রেপ্তার করলো সিহুকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করা হলো। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর সিহু মাঝি লুটিয়ে পড়ল প্রকৃতি মায়ের কোলে। ভাগলপুরের কাছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে চাঁদ ও ভৈরব যুদ্ধ করতে করতে বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু বরণ করলেন। আর কানু?

তাঁরও গোপন আস্তানার সংবাদ লাভ করলো সরকার। বীরভূম জেলার ওপার বাঁধের কাছে ধরা পড়ে গেলেন একদল সশস্ত্র পুলিশের হাতে। তাঁকেও সিহুর মত গুলি করা হল সঙ্গে সঙ্গে। একরকম ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে কানুকে হত্যা করার পর সাঁওতাল বিদ্রোহের হল অবসান।

সাঁওতাল বিদ্রোহ চলেছিল মাত্র একবছরের কিছু অধিক কাল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল। সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ব্যর্থ হয়েছিল বিদ্রোহ দমনে। শেষে গ্রহণ করেছিল বর্বর ও হীন ব্যবস্থা—যা কোন সুসভ্য জাতির পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক ছাড়া কিছুই নয়। একজন সেনাপতি দুঃখ করে বলেছিলেন, "কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমরা যা করেছি—তা যুদ্ধ নয়, ব্যাপক গণহত্যা।" অপর এক সেনাপতি বলেছিলেন, "আমার বাহিনীতে এমন একজনও সিপাহী ছিল না যে এই জঘন্য কাজ করতে লজ্জা বোধ করেনি।"

এই বিদ্রোহের ফলে সাঁওতালদের দাবী অবশ্যই কিছু কিছু পূরণ হয়েছিল। যে মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী ধরা পড়েছিল তাদের মুক্তি দিয়েছিল সরকার। গঠিত হয়েছিল সাঁওতাল পরগণা নামে পৃথক একটি জেলা। সেই জেলার মধ্যে একমাত্র ইউরোপীয় মিশনারী ছাড়া অপরের প্রবেশ হল নিষিদ্ধ। নতুন শাসক নিযুক্ত করা হল, পুরাতন পুলিশ বাহিনীকে বরখাস্ত করে নতুন পুলিশ বাহিনী আনা হল। একটি উপজাতি হিসাবে সরকার স্বীকার করে নিল সাঁওতালদের। রাজস্বই কেবল হ্রাস করা হল না।

সাঁওতাল বিদ্রোহ সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে কম্পিত করে ছেড়েছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সিপাহী বিদ্রোহের পরই সাঁওতাল বিদ্রোহের স্থান এবং সাঁওতাল বিদ্রোহই সিপাহী বিদ্রোহের "অগ্রদূত"। তাই সমগ্র বিপ্লবীদের শিরোভূষণ সিদ্ধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। ভারতের ইতিহাস এঁদের কোনদিন ভুলতে পারবে না।

—::—

নদীয়ার নীল বিদ্রোহের নায়ক বাংলার রবিনহুড বিশ্বনাথ সর্দার বা বিশু ডাকাত

(১৮০৮)

বাংলায় নীলকরগণের অত্যাচার আজও ভুলতে পারেনি বাংলার কৃষক সম্প্রদায়। একরকম ১৭৯৫ সাল থেকেই এদেশে আগমন করতে থাকে সাগরপারের নীলকর গোষ্ঠী। তারপর তারা ১৮৯০ সাল পর্যন্ত প্রায় একশ' বছর চালিয়ে গেছে নীলের ব্যবসা। মনুষ্যত্ব-হীন, অর্থপিশাচ এই সব নীলকররা যেভাবে সাধারণ মানুষকে উৎপীড়ন করেছিল তা আজ দুঃস্বপ্নের মতোই মনে হয়। কিন্তু বাংলার কৃষক মুখ বুজে তাদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করেনি। তাদের ধূমায়িত তীব্র অসন্তোষ এখানে ওখানে বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করেছিল। পরিশেষে আত্মপ্রকাশ করেছিল গণবিদ্রোহ রূপে। বাংলার বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন নায়ক বিদ্রোহকে পরিচালনা করেছিলেন। সেই সব নায়কদের অনেকেরই পরিচয় অজ্ঞাত। তবে যে সব বীর মরণকে তুচ্ছ করে সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন এবং যাঁদের বীরদর্পে ব্রিটিশ সিংহকে নাজেহাল হতে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশ্বনাথ সর্দার, তিতুমীর, দুদুমিঞা, গোলকনাথ রায় প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আবার সর্বপ্রথম যিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন তিনিই বিশ্বনাথ সর্দার। নীলকরদের পৃষ্ঠ-পোষক ইংরাজ সরকার একে 'বিশে ডাকাত' নামে অভিহিত করেছিল। অথচ বিশ্বনাথের মত দরিদ্রের বন্ধু পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ইংরাজদের কাছে তিনি কুখ্যাত ডাকাত

হলেও দেশের মানুষের হৃদয়ে তিনি চিরকাল শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। বিশ্বনাথের জীবনীকাররা তাঁকে ভূষিত করেছেন "বাংলার রবিনহুড" নামে।

নীলের একটু ইতিহাস আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে কাপড়কে রঙ করার জন্য নীলের চাহিদা হয় প্রচুর। তখন রাসায়নিক উপায়ে নীল তৈরীর উপায় উদ্ভাবিত হয়নি। সেই বিরাট চাহিদাকে পূরণ করতে প্রচুর জমিতে নীল চাষ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখনই ইংলণ্ডের দৃষ্টি পড়ে তাদের কাঁচা মাল সরবরাহের কেন্দ্র ভারতবর্ষের উপর।

সুজলা সুফলা হিসাবে বাংলার প্রসিদ্ধি চিরকালই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার উর্বর মৃত্তিকায় নীল চাষ করে নীল সরবরাহের দ্বারা বিরাট মুনাফা লাভের আয়োজন করলো। তখনই কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ছুটে এল বাংলার বুকে। জমিদারদের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষীদের বাধ্য করালো নীল চাষ করতে। সরকার লাভের আশায় নীলকরদের সর্ববিধ সুবিধা দান করলো। এমনকি শান্তিরক্ষার জন্য পাইক পেয়াদা থেকে আরম্ভ করে বিচারের ভারও তুলে দিল তাদের হাতে। তখনই বেপরোয়া লাভের আশায় তাদের হাতে নির্যাতিত হল কৃষক সম্প্রদায়।

প্রথম প্রথম নীলচাষ ছিল সীমিত। পরে নীলকররা চাষীদের ভাল ভাল জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করায়। এমনকি কোন কোন কৃষককে তার অধিকাংশ ধানী জমিতে নীল চাষ করতে হল। নীল চাষে যে পরিমাণ খরচ হতো চাষীরা তার অর্ধেকও পেত না নীলকরদের কাছ থেকে। ধান চাষ উঠলো মাথায়। নীলচাষ করে একরকম বিনি পয়সায় পাঠিয়ে দিতে হল নীল কুঠিগুলিতে। আর স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে বাংলার কৃষককে অনাহারে কিংবা অর্ধাহারে দিন কাটাতে হল।

নীলচাষ না করেও উপায় ছিল না। অবাধ্য চাষীকে নীলকররা

জোর করে ধরে এনে কুঠিতে আটক করে রাখতো। দিনের পর দিন চালাতো নির্যাতন। আর সরকার সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করতো না। দেশের আইন আদালত অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেখানেও সুবিচারের আশা ছিল না। ইংরাজ বিচারকমণ্ডলী সব সময় স্বদেশের মানুষের পক্ষ অবলম্বন করতো। নীলকরদের কোন দোষ তারা দেখতে পেত না। তখনই বাধ্য হয়েই কৃষকদের নামতে হল আন্দোলনে। সে আন্দোলন খেয়ে-বাঁচার আন্দোলন। কিন্তু তাদের সে আন্দোলনে সাড়া দেয়নি সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ। যারা ছিল জমিদার তারা নীলকরদের জমির ইজারা দিয়ে টাকা লুটতে আরম্ভ করলো। প্রজা শোষণে তারাও কম যেত না। আর সরকার? বাণিজ্য করতে এসে চক্ষুলজ্জার ধার ধারত না।

এই অবস্থায় দরিদ্র কৃষকদের পাশে দাঁড়াবার কেউ ছিল না। তাদের সহানুভূতি জানানোর একজনও ছিল না। হাজার হাজার মনুষের যখন উঠেছে নাভিশ্বাস, ঘরে ঘরে অভাব অনটন, দুটো খাদ্যের জন্য মানুষ যখন বনের পশুতে পরিণত হতে চলেছে তখনই নদীয়ায় আবির্ভাব ঘটে বিশ্বনাথের।

নদীয়ার গাদরা ভাতছালা গ্রামে এক দরিদ্র বাগ্‌দির ঘরে জন্ম হয় বিশ্বনাথের। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী। চারদিকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ উৎপীড়ন দেখে বিদ্রোহী হয়ে উঠে তার মন। সেই সঙ্গে অন্তর তাঁর কেঁদে উঠে নিপীড়িত মানুষগুলোর জন্য। প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে করতে যেন দিশেহারা হয়ে উঠলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য আরম্ভ করলেন ডাকাতি।

বিশ্বনাথের এই ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া দ্বিতীয় উপায় অবশ্য ছিল না, ছিল না নিজের অর্থবল। কিন্তু মনটি ছিল ফুলের মত কোমল। কেমন করেই বা তিনি তুলে দেবেন নিরন্নের হাতে অন্ন?

চারিদিকে অরাজক, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, ঘরে ঘরে অন্নাভাব—

বিশ্বনাথের দল গড়তে অসুবিধা হল না। কৃপণ ধনীর সর্বস্ব অপহরণ করে দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বিশ্বনাথ সাজলেন ডাকাত। সহস্রাধিক বলবান ব্যক্তির নেতা হলেন তিনি। এবার আরম্ভ হল তাঁর অভিযান।

সে অভিযান ধনীদের বিরুদ্ধে, বিদেশী নীলকরদের বিরুদ্ধে আর তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি আত্মোৎসর্গ করলেন দেশবাসীর হিতসাধনে।

একটা বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বনাথের নাম। যেইখানে দেখলেন মনুষ্যত্বের অবমাননা, সেইখানে হয়ে উঠলেন কঠোর। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কেবল প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হলেন না, অন্যায়কারীদের প্রদান করলেন শাস্তি। আর নির্যাতিতকে রক্ষা করার জন্য নিয়োগ করলেন সর্বশক্তি। দেশের মানুষের কাছে বিশ্বনাথ পরিচিত হলেন "বাবু" নামে।

যারা ছিলেন সমাজের হিতকারী, তাঁদের সঙ্গে বিশ্বনাথের কোন বিরোধ ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল কৃপণ ও অত্যাচারী জমিদার এবং দুর্বৃত্ত নীলকরদের উপর। তাই বলে অযথা তিনি নররক্তে রঞ্জিত করতেন না হাতকে। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগেই তিনি গৃহস্বামীকে জানিয়ে দিতেন, "আমি তোমার অতিথি হবো।"

গৃহস্বামী স্বেচ্ছায় অর্থ প্রদান করলেই ফিরে আসতেন বিশ্বনাথ। পরিবর্তে বাধা দান করতে এলেই তিনি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতেন। কিন্তু কোন নারী কিংবা শিশুর গায়ে হাত দিতেন না। কোন বাড়ীতে ডাকাতি আরম্ভ করার আগেই নারীদের সসম্মানে সরিয়ে দিতেন এবং শিশুদের অর্পণ করতেন মায়েদের কোলে।

বিশ্বনাথ তাঁর লুণ্ঠনের বেশির ভাগ অর্থই দান করতেন জনসাধারণের মধ্যে। নিজের এবং দলের যতটুকু না হলে চলে না কেবল সেইটুকুই রাখতেন। কোনদিন কোন প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করেননি। কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা উদ্ধার পেয়েছেন বিশ্বনাথের

কৃপায়, কত দরিদ্র দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেয়েছে, কত দরিদ্র কৃষক হালের বলদ কিনেছে, আর মহাজনদের ঋণ শোধ করে ঋণ-মুক্ত হয়েছে কত দুঃস্থ!

লুণ্ঠিত অর্থের কিছু পরিমাণ বিশ্বনাথ রেখে দিতেন দূর্গাপূজার জন্য। প্রতি বছর মহাসমারোহে করতেন দেবী মহামায়ার অকাল-বোধন। পূজা উপলক্ষে চারদিন ধরে বিতরণ করতেন অন্ন। অনাথ শিশু, বৃদ্ধকে দান করতেন বস্ত্র। তাছাড়া সে অঞ্চলে যত দরিদ্র ছিল সবাই বিশ্বনাথের কাছ থেকে লাভ করতো মাসোহারা। শত শত দরিদ্র পরিবার বেঁচে থাকতো তাঁরই দানের উপর।

সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ সহ্য করতে পারল না বিশ্বনাথকে। আর সহ্য করতে পারল না নীলকুঠির সাহেবরা। সেকালে আবার ইংরাজেরা তাঁতীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করার ফলে বিশ্বনাথ রুখে দাঁড়ালেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে। যেখানে-সেখানে হল ইংরাজ কুঠি লুণ্ঠন। যে সব তাঁতী কিংবা কৃষককে ইংরাজরা আটক করে রাখতো বিশ্বনাথ দলবল নিয়ে ছিনিয়ে আনতেন কুঠি থেকে। যে সব দেশীয় কর্মচারী ইংরাজদের সহযোগিতা করতো তাদের ধরে এনে শাস্তি প্রদান করতেন। ফলে কুঠিগুলিতে দারুণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি হল।

স্যামুয়েল ফেডি নামে ছিল এক অত্যাচারী নীলকর। দাদন দিয়ে কৃষকদের জোর করে নীল চাষ করাতে বাধ্য করতো। কেউ অসম্মতি প্রকাশ করলে তার আর উপায় থাকত না। বিশ্বনাথ ফেডিকে যথোচিত শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে একদিন আক্রমণ করলেন ফেডির কুঠি। ফেডিরও দলবল খুব একটা কম ছিল না। উভয় পক্ষে হল তুমুল যুদ্ধ। শেষে ফেডি পরাজিত ও বন্দী হলেন। মিসেস ফেডি আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে খিড়কির পুকুরে মাথায় একটা কালো হাঁড়ি উপুড় করে ডুবে থাকলেন। বিশ্বনাথ তাঁকে কোন কিছু

বললেন না। বরং লক্ষ্য রাখলেন, মিসেস ফেডির যাতে কোন অসুবিধা না হয়।

ফেডিকে বন্দী করে বিশ্বনাথ এবং তাঁর দলবল প্রস্থান করলেন। সেই রাত্রিতেই এক জঙ্গলের মধ্যে হল ফেডির বিচার। বিশ্বনাথের অনুচররা বললো, ফেডিকে এখনই হত্যা করা হোক—ওকে ছেড়ে দিলে আমাদের দলের যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা।

কিন্তু ফেডি প্রাণের দায়ে বিশ্বনাথের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লো। বললো—'জীবনে আর কোনদিন এমন কুকাজ করবো না। আমাকে এই একটিবার মুক্তি দিন!'

ফেডির কাতর প্রার্থনায় বিশ্বনাথের দয়া হল। ভাবলেন, ফেডির দুষ্কর্মের তো যথেষ্ট সাজা হলো। দেখা যাক, লোকটা এর পরে কি করে? তাই বললেন—তোমাকে আমি মুক্তি দিতে পারি, যদি প্রতিজ্ঞা কর, আমার কথা কোনদিন কোথাও তুমি প্রকাশ করবে না।

ফেডি খ্রীষ্টের নামে শপথ করলো। বিশ্বনাথ ছেড়ে দিলেন তাকে। কিন্তু পরদিন ভোরেই ফেডি শরণাপন্ন হল নদীয়ার জেলা শাসক ইলিয়ট সাহেবের।

বিশ্বনাথের খবর অবশ্য অনেক আগেই জেলা শাসকের কর্ণগোচর হয়েছিল। সেও সুযোগ খুঁজছিল বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করার জন্য। আগে বহু কুঠিই লুণ্ঠন করেছিল বিশ্বনাথ। এবার ফেডির উপর অত্যাচার হতে ইলিয়ট সাহেব চুপ করে বসে রইল না। তৎক্ষণাৎ বাংলার শাসনকর্তার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালো। কয়েক দিন পরে একটা বিরাট দল নিয়ে সেনাপতি ব্ল্যাকওয়ার এলো বিশ্বনাথকে শাস্তি প্রদান করতে।

বিশ্বনাথ তাদের কাছে কিন্তু ধরা পড়লেন না। তখন নিযুক্ত করা হল গোয়েন্দাদের। তথাপি সুবিধা করতে পারল না সরকার। অগত্যা বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ঘোষিত হল পুরস্কার।

দুর্ভাগ্য বিশ্বনাথের। ইংরাজ সৈন্যরা একদিন বিশ্বনাথের কয়েকজন অনুচরকে ধরতে সক্ষম হল। তাদের মধ্যে ছিল বিশ্বনাথের পালিত পুত্র। আর সেইই পুরস্কারের লোভে জানিয়ে দিল বিশ্বনাথের গোপন আস্তানার কথা।

নদীয়া জেলার কুনিয়ার কাছাকাছি একটি জঙ্গলে ছিল বিশ্বনাথের ঘাঁটি। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ফেডি সহ ইংরাজ সেনাপতি ব্ল্যাক-ওয়ার সৈন্যদের নিয়ে ঘিরে ফেললো জঙ্গল। বিশ্বনাথ বেকায়দায় পড়ে গেলেন।

এই সঙ্কটকালে যদিও যথেষ্ট সংখক অনুচর সঙ্গে ছিল, তবুও ভাবলেন এতবড় সৈন্যদলের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করলে পরাজয় অনিবার্য। বিশ্বনাথ তখন আপন অনুচরদের প্রাণ বাঁচাতে হলেন তৎপর তাদের রক্ষা করার সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘাঁটি ছেড়ে। ফেডির সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন "ফেডি, একদিন আমি তোমার প্রাণরক্ষা করেছিলাম। তুমিও শপথ করে বলেছিলে আমার অনিষ্ট কোনদিন করবে না। তুমি তোমার শপথ ভেঙ্গেছো।"

তারপর ইংরাজ সেনাপতিকে বললেন—"আমি জীবনে কোনদিন কোন অন্যায় কাজ করিনি। অযথা কারও কেশাগ্রও স্পর্শ করিনি। যা করেছি তা কেবল উৎপীড়িত মানুষের জন্য। প্রতিদানে যদি কোন শাস্তি আমার প্রাপ্য হয়, তাহলে শাস্তি বিধান করুন। সেই শাস্তি আমি হাসিমুখেই গ্রহণ করবো"।

বিশ্বনাথকে বন্দী করে জেলা শাসক ইলিয়টের কাছে প্রেরণ করা হল। আরম্ভ হল বিচারের নামে একটা প্রহসন। উৎপীড়িত জনগণের কাছে চরম দুঃসময়ে যিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাশে, তাঁকে অভিহিত করা হল কুখ্যাত ডাকাত নামে কোন নরহত্যার অভিযোগ এল না, পাওয়া গেল না একটিও সাক্ষী। তবুও বিচারে হল ফাঁসীর আদেশ।

১৮০৮ সালে গঙ্গার তীরে এক অশ্বত্থ গাছের শাখায় বিশ্বনাথকে ফাঁসী দেওয়া হল। তারপর তাঁর মৃতদেহকে একটি লোহার খাঁচায় বন্ধ করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল সেই অশ্বত্থের ডালে। চারদিকে থাকলো সশস্ত্র প্রহরী। বিশ্বনাথের উন্মাদিনী জননী ছুটে এলেন পুত্রের মৃতদেহ ভিক্ষা করতে। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করলো না বৃদ্ধার কথায়। চোখের জলে গঙ্গার তীরভূমিকে আরও পবিত্র করে ছুটে গেলেন অরণ্যের দিকে। সেই থেকে আর কেউ দেখেনি বিশ্বনাথের জননীকে।

আর বিশ্বনাথ? বেঁচে রইলেন নদীয়ার অগণিত মানুষের মনে। আজও বিশ্বনাথের কাহিনী প্রচলিত আছে সেখানকার লোককাব্যে, গাথায় ও সঙ্গীতে। এখনও তাঁকে স্মরণ করে মানুষ, আর উপহার দেয় দু' ফোঁটা চোখের জল।

—: :—

যশোহরে নীল বিদ্রোহের দুই নায়ক
বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস

(১৮৩০-১৮৪৮)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নীল বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে এবং এই সময় থেকে ঐ বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। অনেকে মনে করেন প্রায় ষাট লক্ষ কৃষক অংশ গ্রহণ করেছিলেন এই বিদ্রোহে। নদীয়া, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ-পরগণা, পাবনা এবং ফরিদপুর জেলায় ১৮৬০ সালের দিকে বিদ্রোহ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব দান করেছিলেন বিভিন্ন নায়ক। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস যশোহরে যেভাবে বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন, তা সত্যই অতুলনীয়।

বিষ্ণু বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস দুই ভাই। যশোহরের চৌগাছা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন তাঁরা। তাঁরা বেশ সম্পন্ন কৃষক ছিলেন। পরে তাঁরা দুজনেই এক নীল-কুঠির দেওয়ান নিযুক্ত হন। কথিত আছে, কুঠিতে কৃষকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার দেখে তাঁদের দরদী মন বিচলিত হয়ে উঠে। ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় ও লজ্জায় পরিত্যাগ করেন দেওয়ানের চাকরি। তারপর দুজনে এসে দাঁড়ালেন নিগৃহীত কৃষকদের পাশে।

প্রথম প্রথম গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন তাঁরা। প্রত্যেককে জানাতে লাগলেন নীলকুঠির অত্যাচারের কথা। কৃষকদের ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝাতে লাগলেন: "নিজের জমিতে আজ নিজের কোন অধিকার নেই। সমস্ত জমি নীলকরদের কুক্ষিগত। তাছাড়া তাদের কথামত কাজ করেও লাভ করছি অত্যাচার ও অবিচার। তাই আমরা আর মুখ

বুজে সহ্য করবো না। সমবেত প্রচেষ্টায় উচ্ছেদ সাধন করবো নীলকরদের।"

কৃষকেরা অনেক আগে থেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তাদের মনে জেগে উঠেছিল প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা। তাই খুব বেশি করে আর বুঝাতে হল না। যশোহরের চৌগাছাতেই প্রথম জ্বলে উঠল আগুন। ধীরে ধীরে সেই আগুন স্পর্শ করলো পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেও।

বিশ্বাস ভ্রাতাগণ ছিলেন যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন। বিদ্রোহ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করলেন না। নিজেদের সঞ্চিত অর্থই খরচ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা এও বুঝলেন, যে আগুনকে নিয়ে তাঁরা খেলা আরম্ভ করলেন, সে আগুনে নিজেদের দগ্ধ হতে হবে। সহজে নিষ্কৃতি দেবে না ঐ নীলকর গোষ্ঠী। তবু দমলেন না তাঁরা। বরিশাল থেকে আনালেন লাঠিয়ালদের। দেশের যুবকরা শিখতে আরম্ভ করলো লাঠি খেলা। দেখতে দেখতে গড়ে উঠলো বিরাট এক দল।

আরম্ভ হল বিশ্বাস ভ্রাতাদের অভিযান। যেখানে দেখলেন অত্যাচার, সেইখানেই প্রেরণ করলেন তাঁর লাঠিয়ালের দলকে। বে-আইনী ভাবে আর কৃষকদের কুঠিতে কুঠিতে আটক রাখা গেল না। কৃষকরাও নীল চাষ বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। তখন নীলকররা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে শত শত লাঠিয়াল ঠেকিয়ে আক্রমণ করলো বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল চৌগাছা এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি। বিশ্বাসের দলও চুপ করে থাকলো না। তারাও বাধা প্রদান করলো। রক্তপাতও হল যথেষ্ট। কিন্তু নীলকররা বিশ্বাস ভ্রাতাদের ধরতে পারলো না।

বিশ্বাস ভ্রাতাদের পুনরায় সুরু হল গ্রাম পরিক্রমা। এবার বহু দূরবর্তী গ্রামগুলিতে গিয়েও আরম্ভ করলেন প্রচারের কাজ। রাত্রির অন্ধকারেই তাঁরা যাত্রা করতেন এবং অন্ধকার থাকতে থাকতেই ফিরে আসতেন তাঁদের গোপন আস্তানায়। যশোহর ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে এবার কৃষকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। বয়কট করলো নীল চাষ।

নীলকরদের ব্যবসা এবার শিকেয় উঠলো। তারা তখন উপায় না পেয়ে দরিদ্র চাষীদের নামে আদালতে মামলার পর মামলা দায়ের করলো। বিশ্বাস ভ্রাতাগণ সেই মামলাগুলি নিজের খরচে চালাতে লাগলেন এবং আদালতে আটক কৃষকদের পরিবারবর্গকেও প্রতিপালন করতে লাগলেন।

সরকার অবশ্য এবার নীলকরদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য কিন্তুএগিয়ে এল না। বাংলাকে এতদিনে তারা ভালভাবেই চিনতে পেরেছিল। পলাশীর যুদ্ধের সাত আট বছর পর থেকেই অর্থাৎ সেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পর থেকেই সুরু হয়েছিল বিদ্রোহ। তার চরম বিকাশ ঘটলো সিপাহী বিদ্রোহে। মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে যে চরম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা মাত্র তিন-চার বছরে ভুলতে পারেনি সরকার। তদুপরি সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ক্ষমতা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল পার্লামেণ্ট এবং এদেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য হয়েছিল যত্নবান।

অপরদিকে বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীও বুঝতে পেরেছিলেন দুর্বৃত্ত নীলকরদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী। তাই ১৮৬০-৬১ সালের সমগ্র বাংলা ব্যাপী গণআন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এল না ব্রিটিশ বাহিনী।

দেশের মানুষও তখন যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছিল। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার নির্ভিক সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকরদের বিরুদ্ধে আগুন ছড়াতে আরম্ভ করলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রচার আরম্ভ করলেন নীলকরদের কুকীর্তির কাহিনী। দীনবন্ধু প্রকাশ করলেন তাঁর যুগান্তকারী নাটক "নীলদর্পন।"

বহু ইংরাজও এদেশের চাষীদের দুরবস্থা দেখে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি একখানি পুস্তিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের বীভৎস রূপ। কথিত আছে, দীনবন্ধুও

তাঁর নীলদর্পন প্রকাশ করেছিলেন রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের নামে। পুস্তকটিকে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন মহাকবি শ্রীমধুসূদন।

অবশ্য নীলকররা সহজে এঁদের নিষ্কৃতি দেয়নি। হরিশ মুখার্জির নামে আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেছিল। রেভারেণ্ড লঙ সাহেবকেও বাদ দেয়নি। লঙ সাহেবের হয়েছিল একমাস জেল এবং এক হাজার টাকা জরিমানা। জরিমানার টাকা প্রদান করেছিলেন তৎকালীন তরুণ সমাজসেবক কালিপ্রসন্ন সিংহ—যিনি এক কালে দেশের দুর্নীতিগুলিকে "হুতোম প্যাঁচার নকসা" নামে উড়িয়েছিলেন কলকাতার আকাশে।

বহু সহৃদয় জমিদারও সে সময় এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাধুহাটির মথুরানাথ আচার্য, চণ্ডীপুরের শ্রীহরি রায়ের অবদান সবিশেষ স্মরণীয়। এত কাণ্ডের পর আর চুপ করে থাকতে পারল না সরকার। গঠিত হল "নীল কমিশন"। স্বয়ং ছোট লাট তদন্ত করলেন। কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেটও চাষীদের হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন। এতদিনে রক্ষিত হল কৃষকদের স্বার্থ। নীলচাষ করতে বাধ্য করানো আইন বিরুদ্ধ হল। আর এক বাণ্ডিল নীলের মূল্য চার আনার পরিবর্তে ছ'আনা নির্ধারিত হল। তখন বেশি লাভ না হওয়ায় বহু নীলকর নীলের ব্যবসা ছেড়ে দিল।

জয় হল চাষীদের। আর বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস মামলা চালাতে চালাতে হলেন সর্বস্বান্ত। খরচ হয়েছিল সারা জীবনের সঞ্চয় সতের হাজার টাকা। তবে যে কাজ তাঁরা করে গেছেন, তার মূল্য অর্থ দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না। "বঙ্কিম জীবনী" রচয়িতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর সম্বন্ধে ভারি সুন্দর একটি উক্তি করেছেন। বলেছেন—"এই দুই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বাংলার নিঃস্ব সহায়শূন্য প্রজাদের এক প্রাণে বাঁধিল'। সিপাহী বিদ্রোহের সদ্য নির্বাপিত আগুনের ভস্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল।"

তন্তুবায় বিদ্রোহের নায়ক
ঢাকার দুনিরাম পাল ও শান্তিপুরের বিজয়রাম
(১৭৯০ — ১৮০০)

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় বস্ত্র বিদেশীদের কাছে ছিল একটি বড় রকমের বিস্ময়ের বস্তু! বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় বণিকরা অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এদেশের বস্ত্রও বিদেশে রপ্তানি করতো। দেশে আসত প্রচুর অর্থ। কথিত আছে, রোমের বিলাসী ও ধনী ব্যক্তিরা একমাত্র ভারতীয় বস্ত্রই পরিধান করতেন। এককালে সুদূর বাগদাদ, চীন প্রভৃতি দেশেও ভারতীয় বস্ত্র আমদানী করা হতো।

পাশ্চাত্য বণিকদের ভারতের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল প্রধানত দুটি কারণে। প্রথম কারণ বস্ত্র ও দ্বিতীয় কারণ মশলা। আগে পাশ্চাত্যের সঙ্গে স্থলপথে ভারতের ব্যবসা চলত আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে। তারপর রাজনৈতিক কারণে আরবদের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় পাশ্চাত্যের বণিকরা মহা অসুবিধায় পড়ে। তখনই একরকম মরিয়া হয়ে উঠে জলপথে ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার জন্য। তারই প্রত্যক্ষ ফল ভাস্কোডাগামার ভারতবর্ষে আগমন।

ভাস্কোডাগামার পর ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকরাও ভারতে আগমন করে এবং সরাসরি ব্যবসা আরম্ভ করে। তখন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসন যথেষ্ট শক্তিশালী থাকায় তাদের ন্যায্যমূল্যেই বস্ত্র প্রভৃতি কিনতে হত। তাঁতীদের ঘরেও আসতো পয়সা। দেশের ও বিদেশের বাজারে কাপড় সরবরাহের জন্য ভারতবর্ষের বহু স্থানেই গড়ে উঠেছিল অতি উন্নতমানের বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র। সেই সব কেন্দ্র-গুলির মধ্যে আবার বাংলা ছিল অগ্রণী! ঢাকা, মালদহ, শান্তিপুর,

হরিপাল, সোনামুখী, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুমারখালি, কাশিমবাজার, মণ্ডলঘাট, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানের শিল্পীরা এত উন্নতমানের বস্ত্র বয়ন করতো যে তার তুলনা বিশ্বের কোথাও ছিল না। বাংলার মসলিন বস্ত্র পৃথিবীর কাছে ছিল রীতিমত বিস্ময়ের বস্তু। পৃথিবীতে যত রাজরাজড়া ছিলেন সবাই চাহিদা করতেন মসলিনকে।

বাংলার তন্তুবায়রা আবার বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন বস্ত্র বয়ন করতেন। আমির ওমরাহদের জন্য তৈরী করতেন "সরকার আলি" নামে সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র। শাদের হারেমের জন্য প্রস্তুত হতো প্রসিদ্ধ "জামদানি" শাড়ি। শিরস্ত্রাণের জন্য তৈরী হতো "শিরবন্দ"। আর তাঁতীরা "সান্ধ্য শিশির" নামে যে বিস্ময়কর বস্ত্রটি বয়ন করতেন, সেটি সন্ধ্যাকালে ঘাসের উপর পেতে দিলে শিশির পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যেত বলে মনে হতো। আরও আশ্চর্যের বিষয়, যেকালে এক টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত সেকালে একখানা জামদানি শাড়ির দাম ছিল পাঁচশ টাকার কাছাকাছি।

আরও কত উন্নত ধরণের বস্ত্র বয়ন করতেন বাংলার তাঁতীরা। মলমল, নয়নসুক, ডুরি, বদনখাস, সরবতি, জঙ্গলখাসা, অমৃতি প্রভৃতি বস্ত্র বিদেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

বাংলায় নবাবদের আমল পর্যন্ত বাংলার তাঁতীরা ছিলেন স্বাধীন। বস্ত্র বয়নের জন্য তাঁদের কোন প্রকারের কর দিতে হতো না। অপরদিকে বাংলার বস্ত্র চড়া দামে বিক্রি হতো বলে অধিকাংশ কৃষক একমাত্র চাষবাসের সময়টুকু ছাড়া অন্য সময় বস্ত্রবয়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এক একখানা জামদানি শাড়ী কিংবা মসলিন তৈরি করতেও দরকার হত প্রচুর সময়ের। শাড়ীগুলি লম্বায়ও খুব কম ছিল না। ঔরঙ্গজীব-কন্যা গায়ে মাত্র আঠার পাক জড়িয়ে জামদানি শাড়ী পরেছিলেন বলে, ছোট কাপড় পরার জন্য তিরস্কৃতা হয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। এই ক্ষুদ্র ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে কত সূক্ষ্ম, কত দীর্ঘ ছিল বাংলার শাড়ী এবং কী পরিমাণ সময় নষ্ট করতে হতো তাঁতীকে।

সেকালে আবার তাঁতীদের মূলধনেরও প্রয়োজন হতো না। বেকারও থাকতেন না কেউ। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং ঘরের মেয়েরা সূতো কাটতেন। তাঁতীরা উচিত মূল্যে তা কিনে নিতেন। ঘরে ঘরে ছিল তাঁত, ক্ষেত-খামার ছিল প্রত্যেকেরই। তাই ঘরে ঘরে ছিল সুখ, ঘরে ঘরে ছিল সমৃদ্ধি। তাই নাম হয়েছিল সোনার বাংলা। কিন্তু এই সমৃদ্ধিই শেষ পর্যন্ত কাল হল বাংলার। অর্থলোলুপ বিদেশী বণিকরা বাংলা ছেড়ে আর গেল না।

পলাশীর যুদ্ধ শেষ হল। এতদিনে ব্রিটিশ বণিকেরা হল বাংলার ভাগ্যবিধাতা। নিজেদের আজ্ঞাবাহী এক নবাবকে সামনে রেখে দুর্বার গতিতে চালিয়ে গেল একটানা শাসন, শোষণ ও উৎপীড়ন। যে তাঁতীরা এতকাল স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল তাদের উপর জারি হল নানা বিধিনিষেধ। অপরকে বস্ত্র বিক্রয় হল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ঐ ইংরাজ বণিকেরাই হল একচেটিয়া ক্রেতা। তখন তাঁতীদের তারা বাধ্য করালো দাদন গ্রহণ করতে। তারা উচিত দাম আর পেল না। এমনকি একখানা কাপড় তৈরি করতে যতটুকু খরচ হয় তাও তারা পেল না। তখন তারা দাদন গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলো এবং অস্বীকার করলো ইংরাজ বণিকদের বস্ত্র বিক্রয় করতে। আর তখনই তাদের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে উঠলো ঘোর দুর্যোগের কালো মেঘ।

পরাধীন দেশের সামান্য তাঁতী হয়ে মহামান্য ইংরাজের আদেশকে প্রত্যাখান করায় তাদের নীল রক্তে আরম্ভ হল প্রচণ্ড আলোড়ন! যাদের তারা মানুষ বলে মনে করতো না, তাদের শাস্তিদানের জন্য ক্রুদ্ধ ইংরাজ বণিকরা নিয়োগ করলো গোমস্তাদের। গোমস্তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলো এবং বল প্রয়োগের দ্বারা তাঁতীদের দাদন গ্রহণ করতে বাধ্য করালো। তথাপি যারা অস্বীকার করলো তাদের জোর করে ধরে আনলো কুঠিতে। দিনের পর দিন চালালো বর্বরোচিত অত্যাচার। শেষে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। কেবল তাই নয়,

নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক কাপড় দিতে হবে—এমন অঙ্গীকারও করতে হল। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও তাঁতীদের উপর চাপানো হল মাত্রাতিরিক্ত বোঝা। তবুও যদি মূলধনটা তাদের ঘরে আসতো, তাও নয়। কত আর অত্যাচার সহ্য করবে, আর কতই বা ক্ষতি স্বীকার করবে? অল্প দিনের মধ্যেই হাহাকার পড়ে গেল তাঁতীদের মধ্যে।

এবার তাঁতীরা তাঁত বন্ধ করতে বাধ্য হল। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কেটে ফেললো নিজেদের বুড়া আঙ্গুল। কেউ বা পালিয়ে গেল বনে। কেউ বা বিদ্রোহীদের দলে ভিড়ে গেল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের দলে এমন কত নিঃস্ব তাঁতী গিয়ে তাদের দলকে পুষ্ট করেছিল।

তবুও কিছু কিছু তাঁতী ইংরাজদের রক্তচক্ষুকে ভয় না করে চালিয়ে যেতে লাগলো তাদের স্বাধীন ব্যবসা। কেউ কেউ দাদন গ্রহণ করলো, কিন্তু নিকৃষ্ট মানের কাপড় তৈরি করে বণিকদের দিল আর গোপনে গোপনে ভাল কাপড় বিক্রি করতে লাগলো ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের। কিন্তু ইংরাজদের দৃষ্টিকে তারা ফাঁকি দিতে পারল না। অবাধ্য তাঁতীদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে এবার নিযুক্ত হল চৌকিদার। চৌকিদাররা ইচ্ছামত তাঁতীদের আটক রেখে দাদন গ্রহণ করতে বাধ্য করালো, বেতন আদায় করলো তাঁতীদের কাছ থেকে আর অধিক মুনাফার জন্য ইংরাজ বণিকদের দ্বারা নির্ধারিত মূল্যের উপর শতকরা পনের-বিশ টাকা কমে কাপড় কিনতে লাগলো।

এবার বেশির ভাগ জায়গায় তাঁত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নির্ভর করলো একমাত্র কৃষির উপর। কিন্তু সেখানেও বসে ছিল নীলকররা। বাংলার তাঁতী আর বাংলার কৃষক উপস্থিত হল সর্বনাশের চরম সীমায়।

এত দুঃখেও কোথাও কোথাও তাঁতী সংঘবদ্ধ হল। প্রথম রুখে দাঁড়ালো মসলিন নির্মানের কেন্দ্র ঢাকার কারিগররা। ইংরাজ কুঠির সামনে একদিন প্রদর্শন করলো বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের নেতা

ছিলেন বোষ্টম দাস নামে একজন কারিগর। ইংরাজ বণিকরা বোষ্টম দাসকে আটক করলো কুঠিতে। তারপর আরম্ভ করলো অমানুষিক নির্যাতন। ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করতে করতে মৃত্যু বরণ করলেন বোষ্টম দাস।

বোষ্টম দাসের মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তন্তুবায়গণ। ইংরাজ বণিকদের নির্মম অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের জন্য গড়ে তুললো আন্দোলন। আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন দুনিরাম পাল নামে এক তন্তুবায় কারিগর। প্রথমে তিনি তন্তুবায়দের একত্রিত করলেন। তারপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "বোর্ড অব ট্রেড" এর কাছে একটি দরখাস্ত পেশ করলেন। ঐ দরখাস্তে ইংরাজ বণিকদের উৎপীড়নের কাহিনী এবং বোষ্টম দাসের মৃত্যু সবিস্তারে উল্লেখ করা হল। অভিযোগ করা হল, দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যে হারে বেড়ে চলছে তাতে পূর্বের দামে বস্ত্র সরবরাহ আর সম্ভব নয়।

বোর্ড অব ট্রেড অগ্রাহ্য করলো তন্তুবায়দের দাবী। এবার দুনিরাম আরম্ভ করলেন একটানা নাশকতামূলক কাজ। যেখানে-সেখানে আরম্ভ হল বিদ্রোহ। কোথাও কোথাও আক্রান্ত হল ইংরাজ কুঠি। অবশেষে দুনিরামের নেতৃত্বে তন্তুবায়রা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, আর ভাল বস্ত্র তারা বয়ন করবে না। নিকৃষ্ট সূতায় নিকৃষ্ট বস্ত্রই বয়ন করবে। এবার ইংরাজ বণিকেরা অনেকখানি অসুবিধায় পড়লো, বাধ্য হল আপোসের জন্য। দুনিরামের নেতৃত্বে ঢাকার তন্তুবায়দের স্বার্থ কিছুটা রক্ষিত হল।

অতঃপর দুনিরাম কুমারখালির তন্তুবায়দের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানেও তন্তুবায়দের সংঘবদ্ধ করে চালাতে লাগলেন আন্দোলন। বলাই, ভিখারি, ফকিরচাঁদ প্রভৃতি তন্তুবায়গণ সর্বতোভাবে সহযোগিতা করলেন দুনিরামের। এখানেও তৈরী হল নিকৃষ্ট বস্ত্র।

অনেকাংশে সফল হল দুনিরামের আন্দোলন। ঢাকা ও কুমারখালি অঞ্চলে বেআইনি প্রহার ও আটক হল বন্ধ। তন্তুবায়দের কাছ থেকে

জোর করে স্বীকৃতিপত্র আদায় করা বন্ধ করলেন এবং উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য বাড়াতে সক্ষম হলেন।

সেই সময় শান্তিপুরের তন্তুবায় কারিগররাও গড়ে তুলেছিলেন এক প্রতিরোধ সংগ্রাম। এখানকার সংগ্রামীদের নেতা ছিলেন বিজয়রাম। দীর্ঘকাল ধরে বিজয়রাম শান্তিপুরের আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। ইংরেজদের বস্ত্র সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। ফলে ইংরাজ বণিকগণ শান্তিপুরের তাঁতীদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় আরম্ভ করে। কিন্তু বিশেষ সফল হতে পারেনি। দূর থেকে কুঠির লোকজনদের আসতে দেখলে শঙ্খধ্বনির দ্বারা তন্তুবায়দের সাবধান করে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বিজয়রাম। তন্তুবায়রা তারপর জড় হতেন গোপন কোন জায়গায়। সেইখানেই নির্ধারিত হতো কর্তব্য।

বিজয়রাম বহুদিন ধরে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। সরকারের কাছে প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন বহুবার। তথাপি কোম্পানীর কর্মকর্তারা আদৌ আমল দেয়নি তাঁর প্রতিবাদে।

বিজয়রাম জীবদ্দশায় আন্দোলনের মাধ্যমে কোন সুবিধা আদায় করতে পারেননি। তথাপি শান্তিপুরের তন্তুবায় আন্দোলনের পরিচালক হিসাবে তিনি অমর হয়ে আছেন। পরবর্তী কালে তাঁরই পথ অনুসরণ করেছিলেন লোচন দালাল, রামহরি দালাল, রামরাম দাস, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল প্রভৃতি তন্তুবায় কারিগরগণ। কিন্তু অনুরোধ উপরোধের ধার ধরতো না ইংরাজরা। এদেশের মানুষকে মানুষ বলেও মনে করতো না। তাই শান্তিপুরের দীর্ঘকালের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। সেই সঙ্গে একরকম বন্ধ হয়ে গেছিল বস্ত্রবয়ন।

ঢাকা, কুমারখালি, শান্তিপুরের ঢেউ বাংলার বুকে যে স্পন্দন এনেছিল, তার ফলে গড়ে উঠেছিল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে তন্তুবায়দের প্রতিরোধ আন্দোলন। তন্মধ্যে চন্দননগর এবং হরিপালের আন্দোলনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার আন্দোলনের পরিচালক ছিলেন নয়ন নন্দী।

এত সংগ্রাম করেও তন্তুবায়রা ইংরাজ বণিকদের কাছ থেকে কোন সুবিচার লাভ করেনি। তখনই তারা বাধ্য হয়েছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহে সামিল হতে। তাদের অর্থবল ছিল না, আর ছিল না সারা

বাংলাব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা। এও বুঝেছিল, সশস্ত্র বিপ্লব না ঘটলে ইংরেজ বণিকদের জব্দ করা যাবে না। মনে হয়ত ক্ষীণ আশা ছিল, সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে এ দেশ থেকে। তাই অনেক আশা নিয়েই তাঁতীরা যোগ দিয়েছিল বিদ্রোহীদের দলে।

১৮০০ সালে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের হল অবসান। বহু জনে হারালো প্রাণ। দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালানোর ফলে অবসাদও এসেছিল।

তন্তুবায় শোষণের বীভৎস রূপ দেখে তাঁতের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করলো না কেউই। ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেল বাংলার এই মহান কুটির শিল্পটি।

অপরদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্পে এল বিপ্লব। একটি যন্ত্র অবলীলাক্রমে একশ' জন লোকের কাজ সম্পন্ন করলো। প্রয়োজন হল প্রচুর কাঁচা মালের। তখনই বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান থেকে লুন্ঠিত হল তুলা। সাগরপারের বস্ত্র শিল্প যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আরও হল উন্নত। তখনই ইংলণ্ডের প্রস্তুত বস্ত্রের একচেটিয়া বাজার হল ভারত। জোর করে গলা টিপে হত্যা করা হল ভারতের বস্ত্রশিল্পকে। তার জায়গায় ভারতের মানুষকে কিনতে হল বিদেশী বস্ত্র। যে তাঁতীদের জোর করে দাদন দিয়ে তাঁতে বস্ত্র বয়ন করাতে বাধ্য করতো, সেই তাঁতীরা যাতে বস্ত্র বয়ন করতে না পারে তার জন্যও হল সচেষ্ট। এত দুঃখের মধ্যেও যে সব তাঁতীর ঘরে তাঁত ছিল, এবার তাও বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কিংবদন্তী হয়ে থাকলো বাংলার সেই মসলিন, জামদানি আর সাঙ্কাশিশির। দুশো বছর আগে যা পৃথিবীর বাজারকে মাৎ করে দিতো তা আজ চোখে দেখারও সৌভাগ্য হল না কারও।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অবসানের মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৩৫ সালে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ইংলণ্ডের "বোর্ড অব ডাইরেকটরের' কাছে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেছিলেন—"ভারতের সুপ্রাচীন বস্ত্র শিল্পের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বস্ত্র শিল্পীদের অস্থিতে ভারতের মাটি সাদা হয়ে গেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিহাসে এমন দুর্দশা আর কোথায় দেখা যায়নি"।

।। সমাপ্ত ।।